সিংহাবলোকন

সিংহাবলোকন

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭০

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সাহিত্যালোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬
থেকে প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ হতে মুদ্রিত

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

সূচী

সিংহাবলোকন

আমার পঞ্চসপ্ততি পূর্তির পর আমার এক বন্ধু আমাকে বলেন, "এইবার আপনি একবার সিংহাবলোকন করুন। আত্মজীবনী লিখুন।"

সিংহাবলোকন কথাটা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু তার তাৎপর্য কী তা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। বন্ধু চান যে আমি একবার পেছন ফিরে তাকাই আর যতখানি দেখতে পাই ততখানি দেখাই। অর্থাৎ আমার জীবন-কাহিনী লিখি। এ প্রস্তাব আগেও যে কেউ কেউ করেননি তা নয়। আমি রাজী হইনি। কেন, তার কারণ এই যে, আমার জীবন তো আমার একার জীবন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুজনের জীবন। তাঁরা হয়তো পাঠক সাধারণের সামনে আসতে চান না। সঙ্কোচ বোধ করেন। কেমন করে তাঁদের কেউ কেউ আমার জীবনের গতি বদলে দিলেন, মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, একথা খোলাখুলি বলতে গেলে তাঁরা বিব্রত হতে পারেন। যেসব কথা প্রাইভেট সেসব কথা পাবলিককে শোনাতে যাওয়া কি উচিত? আমার হাতে কলম আছে বলেই কি আমি প্রাইভেটকে পাবলিক করার অধিকারী? তার আগে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু তা হলে আবার অনেক কিছু বাদসাদ দিতে হয়। এটাও একপ্রকার সেনসরশিপ।

পরের জীবনের উপর আমার কোনো অধিকার নেই। বন্ধু হলেও না। প্রিয়জন হলেও না অথচ পরের জীবনকে পদে পদে এড়িয়ে চললে নিজের জীবনের কতটুকু বাকী থাকে! অচিন্ত্যকুমার এর একটা সমাধান করেছিলেন তাঁর 'কল্লোলযুগে'। আমাকে বলেছিলেন, "আমি সকলেরই প্রশংসা করেছি। একজনেরও নিন্দা করিনি।" ভালো। কিন্তু ওই নীতি অনুসরণ করে প্রামাণিক ইতিহাস লেখা যায় না। অপর পক্ষে, যে যেমন তাকে তেমন করে আঁকাও নিরাপদ নয়। তা ছাড়া যিনি আঁকবেন তাঁর নিজেরও তো ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে। আমি যাকে যা মনে করেছি সে হয়তো তা নয়। আমারই দেখার ভুল বা বোঝার ভুল। এক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের মতো সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সবাইকে খুশি করা বা সকলের মন রেখে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। সাহিত্যিক বন্ধুদের সম্বন্ধে আমি সেইজন্যে নীরব থাকি।

সাহিত্যিকদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তেমনি রাজপুরুষদের জীবনের সঙ্গেও। সেইজন্যে এঁদের সম্বন্ধেও আমি নীরব। অথচ আমার জীবন কেটেছে এঁদের সঙ্গেই বেশীর ভাগ, যতদিন না আমি রাজকর্ম ত্যাগ করেছি। আত্মজীবনী লিখতে গেলে এঁদের কথাও পদে পদে উঠবে।

দশটা পাঁচটা রাজকর্মের, বাকী সময়টা সাহিত্যসৃষ্টির, এভাবে কি একটা শ্রমবিভাগ সম্ভব নয়? আমার ধারণা ছিল সম্ভব। কিন্তু দেখা গেল অসম্ভব। সরকারী কাজ হচ্ছে সব সময়ের কাজ। হোল টাইম জব। সকালবেলা সাক্ষাৎ-প্রার্থীরা এসে উপস্থিত। কেন, ওঁরা আপিসে গিয়ে দেখা করেন না কেন? তাতে ওঁদের অসুবিধে। আপিসের কেরানীদেরও। আদালতের উকীল মোক্তার বিচারপ্রার্থীদেরও। আমি বলি আমি সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্যে সন্ধ্যা-বেলাটা খালি রাখতে রাজী। সকালবেলা আমি লিখতে চাই। কারা গিয়ে আমার উপরওয়ালার কাছে নালিশ করে যে, চিরকাল যা হয়ে এসেছে এখন সেটা ইনি উল্টে দিতে যাচ্ছেন। সকালবেলার বদলে সন্ধ্যাবেলা সাক্ষাৎকার। এতে লোকের কত অসুবিধে! উপরওয়ালা আমাকে বলেন, "আপনি লিখতে চান তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সরকারী কাজকর্মের চিরকালের ধারা বদলে দিতে গেলে পাবলিকের আপত্তি হবে। লোকের সঙ্গে মেলামেশা করাটাও আপনার কর্তব্য। তা নইলে প্রশাসনের উপর দখল জন্মায় না। রাজা কর্ণেন পশ্যতি। লিখতে চান অন্য সময় লিখবেন।"

এর পরে আমি সকালবেলাটা ছেড়ে দিই সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্যে। কিংবা আরো পাঁচরকম সরকারী কাজের জন্যে যা আপিসে বা আদালতে বসে করা সম্ভব নয়। তা হলে কি আমি সন্ধ্যাবেলা ফ্রী? না, তাই বা কী করে সম্ভব? বড়ো বড়ো সরকারী আমলারা যদি কল করতে আসেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে না? তাঁদের ওখানে গিয়ে রিটার্ন দিতে হবে না? ক্লাবে গেলে দু'-পক্ষেরই সুবিধে। সেখানে বসে সরকারী বিষয়ে কথাবার্তাও বলা যায়, এক বিভাগের সঙ্গে আরেক বিভাগের সহযোগিতাও করা যায়। ক্লাব কেবল খেলাধূলা বা পানাহারের জন্যে নয়। ওর যেমন একটা সামাজিক দিক আছে তেমনি আছে একটা প্রশাসনিক দিক।

তা হলে লিখব কখন! আর সকলে যখন শুতে যায় তখন? রাত জাগলে শরীর টেকে? লেখাটা তো এক আধ রাতের ব্যাপার নয়। আমার লেখার

কাজ ছুটির দিনের জন্যে শিকেয় তুলে রাখতে হয়। কিন্তু ছুটির দিনেও কি আমার ছুটি আছে নাকি? সরকারী কাজ সময় অসময় মানে না। ছুটির দিনেও অঘটন ঘটে, উপরওয়ালারা পরিদর্শনে আসেন, বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনে আমাকেও বেরোতে হয়। ছুটির দিনেও খুনজখমের বিরাম নেই। পুলিশ থেকে রিপোর্ট আসে, কখনো কখনো আসামীকেও হাজির করে দেওয়া হয়। সরকারী কাজ মুলতুবি রেখে সাহিত্যের কাজ করা যায় না। সরকারী কাজের চাপে বা তাড়নায় সাহিত্যের কাজই মুলতুবি রাখতে হয়। তাতে সাহিত্যের ক্ষতি। লেখায় ছেদ পড়লে বা লেখা যেমন-তেমন হলে উৎকর্ষ থাকে না। পরিমাণও কমে যায়। আমি পরিমাণকে কমতে দিয়েছি, কিন্তু উৎকর্ষকে নামতে দিইনি। লিখতে হবে, আরও লিখতে হবে, এটাব আশা আমি একবকম ছেড়েই দিই। যেটুকু লিখতে পারব সেটুকু ভালো হবে, আরো ভালো হবে, এই হয় আমার আকাঙ্ক্ষা। পরীক্ষা করে দেখা গেল কোনোটাই পূর্ণ হবার নয়। না আশা, না আকাঙ্ক্ষা। জজ হয়ে আমার অবসর কিছু বাড়ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাডল অস্বস্তি। আমার কাজকর্ম ছিল চাষী আর জমিদার, মজুর আর ব্যবসাদার, সন্ত্রাসবাদী আর অহিংসাবাদী, মন্ত্রী আর এম. এল. এ., ছাত্র আর অধ্যাপক প্রভৃতি সবরকম লোক নিয়ে। এতে ঝঞ্ঝাট অনেক, কিন্তু বৈচিত্র্যও প্রচুর। তার বদলে মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে দিনগত পাপক্ষয়। আইনের চুলচেরা প্রশ্ন। অপরাধের ভারী ভারী দণ্ড। তাও কি সুনিশ্চিত হতে পারি যে একজনও নির্দোষীকে সাজানো মামলায় জড়ানো হয়নি? সাক্ষীরা সবাই সত্যবাদী? আমাদের বিচারব্যবস্থা এমন যে পুরো সত্য বা হোল ট্রুথ জানবার কোনো উপায় নেই। কী ঘটেছিল সেটা হয়তো বা জানা যায়, কিন্তু কেন ঘটল, ঘটনার পটভূমিকা কী তা জানতে হলে কেবল বিচারক নয়, মনস্তত্ত্ববিদ্ বা সাইকিয়াট্রিস্ট হতে হয়।

মোদ্দা কথা হলো অভিজ্ঞতা ছাড়া সাহিত্য হয় না, এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য সরকারী কাজকর্মের বারো আনা অভিজ্ঞতাই সাহিত্যের দিক থেকে নিষ্ফল। তা যদি না হতো তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার প্রতিফলন থাকত। বাকী চার আনা দিয়ে বড়ো জোর একখানা উপন্যাস লেখা যায়। তার বেশী লিখতে গেলে পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। সেই একখানা উপন্যাসও কি কালোত্তীর্ণ হবে? হবে কী করে, যদি রসোত্তীর্ণ না হয়? আর রসোত্তীর্ণ হবে কী করে,

যদি নারী চরিত্র না থাকে, নায়িকা না থাকে? মহিলারা ইদানীং হাকিম হচ্ছেন, কেরানী হচ্ছেন, পুলিশেও কাজ করছেন। সেকালে তাঁদের ভূমিকা ছিল হাকিমের স্ত্রী বা কেরানীর বোন বা পুলিশের মা। তাও পর্দানশীন। অতি সংকীর্ণ একটি সামাজিক চক্রের ভিতরেই নারী চরিত্রের অন্বেষণ করতে হবে। তবে অপরাধিনীদের মধ্যেও কেউ কেউ উপন্যাসে স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু তার জন্যে চাই টলস্টয়েব মনীষা। অপরাধিনীদের সঙ্গে আমি ভয়ে ভয়ে মিশেছি। প্রাণের ভয়ে নয়, মানের ভয়ে। লোকে ভাববে কী! যদি কেউ বলে, "হাকিমও তো প্রেমে হাবুডুবু!" বাড়ীতেও যদি সে খবর পৌছায়। আদালতে আমাকে প্যাঁচার মতো গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে থাকতে হতো। তবু লক্ষ্য করেছি রূপযৌবন। দুতিনটি ধর্ষিতা নারীর মুখ আমার এখনো মনে পড়ে। কারো কারো নামও। এদের কাহিনী আমি সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তা বলে তাই দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব না। বিষয়টাই কুৎসিত। পারতেন হয়তো ডস্টয়েভস্কি। খুন নিয়েও তো তিনি সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন। আমি খুনের মামলার সাক্ষ্য নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করেছি, কিন্তু সহ্য করতে পারিনি। যার যা অসহ্য তা নিয়ে তার নাড়াচাডা করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি যে আমি নিজেই যেন কাউকে খুন করে মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছি। এ কী অভিশাপ! তবু তো কারো প্রাণদণ্ড দিইনি বা কারো ফাঁসীর সময় হাজির থাকিনি। সেটাও ডিউটির মধ্যে পড়ে একজন অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের। আমার সরকারী কর্মজীবনকে আমি ইচ্ছা করেই সংক্ষিপ্ত করেছি। তার একাধিক কারণ। কিন্তু আসল কারণটাই আমার অন্তরাত্মার নির্দেশ। ও পথে গিয়ে কেউ কোনোদিন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেনি। আমাব 'সত্যাসত্য' যদি সার্থক সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেটা আমার সরকারী কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তির জোরে নয়। তার পূর্ববর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিব জোরে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তির জোরে "রত্ন ও শ্রীমতী'ও লেখা হয়। আমার তো ইচ্ছা ছিল সেইখানেই দাঁড়ি টানব ও কবিতার রাজ্যে ফিরে যাব। সরকারী কর্মজীবন আমার কবিজীবনের চরম ক্ষতি করেছে। অবসরজীবনেও সে ক্ষতির পূরণ হয়নি। কিন্তু আমাকে টানছে আমার সরকারী কর্মজীবনের সেই সাত আট বছর যে কয় বছরে ভারতের ভাগ্য ও পৃথিবীর ভাগ্য দীর্ঘকালের জন্যে নির্ধারিত হয়ে যায়। ভারত হয়ে যায় স্বাধীন অথচ দ্বিখণ্ডিত। ইউরোপও

তো হয়ে যায় নাৎসী কবলমুক্ত অথচ আধাআধি লাল। আপিস আদালতের বাইরেও চোখ কান খোলা রেখেছি। ঘটনার পদযাত্রার সঙ্গে তাল রেখেছি। সেই কয় বছর আমি ছিলুম জজের পদে। তাতে আমার শাপে বর, কংগ্রেসের আরো কাছাকাছি আসতে পেরেছিলুম। সময়ও পেয়েছিলুম ভাবনা চিন্তার। একটা ভিত্তি তৈরি হচ্ছিল অন্য কোনো সৃষ্টির। সেটা তৎকালে স্পষ্ট হয়নি। হলো পরবর্তী কালে। এতদিনে সুস্পষ্ট হয়েছে। আমি যার ধ্যান করছিলুম তা দেশের ও বিশ্বের পুনর্নবীকরণ। রেনেসাঁসের মতো এককথায় রিনিউয়াল। এখন এই নিয়ে আছি।

আকস্মিক

জীবনটাও একটা শিল্প। তাকেও একটি শিল্পের মতো নিজের হাতে গড়ে তুলতে হয়। যে তা পারে সে জীবনশিল্পী। পঞ্চাশ বছর আগে এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু আজ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি আমার নিজের জীবনই একরাশ আকস্মিক ঘটনার মালা। ঘটনার উপরে আমার হাত ছিল না। তা হলে কি বলব এসব অদৃষ্টের খেলা? তা যদি বলি তবে জীবনটা একটা শিল্প নয়। মানুষও জীবনশিল্পী নয়। সে নিমিত্তমাত্র। জীবনটা যদি মনের মতো না হয় তবে আফসোস করা বৃথা। যা আমার নিজের অপরিকল্পিত তার জন্যে যদি সাধুবাদ দিতে হয় তো আমাকে নয়, আমার জীবনদেবতাকে।

ছেলেবেলায় আমার পড়াশুনায় মন ছিল না। স্কুলে ভর্তি হয়েছি আটবছর বয়সে। তার আগে যে আমি নেহাৎ মূর্খ ছিলুম তা নয়। সন্ধ্যাবেলা আমাকেই বলা হতো কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করে শোনাতে। শুনতেন ঠাকুর্দা ঠাকুমা মা বাবা কাকারা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীদাসের মহাভারতও বাড়ীতে ছিল। পড়ে শোনাতে হতো না, যেখানটা ভালো লাগত পড়তুম। তার চেয়ে অনেক বেশী জানতুম ঠাকুমার মুখে শুনে। পড়ার চেয়ে শোনার পার্টটাই ছিল বেশী। আমি ঠাকুমার কোলেই মানুষ। আমাকে তিনি মার কাছে শুতে দিতেন না। নিজের কাছেই শোয়াতেন।

একদিন এক আকস্মিক ঘটনা ঘটে। বাবা আমার হাতে একটা আলমারির চাবী দিয়ে বলেন, "এখন থেকে এই লাইব্রেরীর ভার তোর উপরে।" বেশীর ভাগই বাংলা গ্রন্থাবলী। বসুমতীর উপহার। বাবা কিনতেন প্রত্যেক বছর নামমাত্র মূল্যে। সাপ্তাহিক 'বসুমতী' এলেই তিনি আমাকে পড়তে দিতেন। পরে ইংরেজী সাপ্তাহিক বা অর্ধসাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী'। বুঝতে না পারলে বলতেন ডিক্‌সনারি দেখতে।

বাবা কিন্তু কোনোদিন আমাকে পাঠ্যপুস্তক পড়তে বলতেন না। বাড়ীর লাইব্রেরীতে যা পড়তুম তা অপাঠ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, দারোগার দপ্তর, রুশ জাপানী যুদ্ধের ইতিহাস, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের পদাবলী। একখানা মলাটহীন বই ছিল, সেটা আমেরিকার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে।

একখানা নিষিদ্ধ পুস্তক ছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা'। এসব বই পড়তে পড়তে আমি আধুনিক রূপকথা ও পুরাণের গণ্ডী অতিক্রম করি। বাবা মা ইতিমধ্যে বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাড়ীতে কীর্তনের ধুম পড়ে যায়।

স্কুলে গিয়ে আমি ছাত্রহিসাবে সুনাম অর্জন করিনি। স্কুলের লাইব্রেরীর উপরেই ছিল আমার অনুরাগ। বাংলা বই ছিল প্রচুর। বাঙালী হেডমাস্টার পরম্পরার কল্যাণে। সেইখানেই রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করি। ইংরেজী বই ছিল বিস্তর। ছোটদের স্কট, ডিকেন্স ইত্যাদি গোগ্রাসে গিলি। ইতিহাস আর ভূগোল ছিল আমার প্রিয় বিষয়। মানচিত্র দেখা আমার প্রিয় ব্যসন। শৌচাগারে গেলেও আমি অ্যাটলাস হাতে করে যেতুম। জানিনে কেন হেড-মাস্টার মশায় আমাকে একদিন ম্যাগাজিন রুমের চাবী দিয়ে বলেন, "এখন থেকে তুমিই মাসিকপত্রগুলোর চার্জে।" আমি যেন আলী বাবা, আর এই যেন ডাকাতদের গুপ্তধন। ক্লাস কামাই করে গুপ্তধন পাহারা দিই। তার মানে আমিই আর সবাইকে বাইরে রাখি। পড়তে পড়তে নেশা ধরে যায়। এত-রকম এতগুলো মাসিকপত্র কখনো চোখে দেখিনি। তখনকার দিনের সব নাম করা পত্রিকা। তবে 'প্রবাসী' তার মধ্যে ছিল না। 'প্রবাসী' আমি নিয়ে আসতুম হেডমাস্টার মশায়ের বাসা থেকে। 'ভারতবর্ষ' সবে বেরোতে শুরু করেছে। অত দাম দিয়ে কে কিনবে? স্কুলও না, মাস্টার মশায়ও না। তবে কিনতেন দু'জন কি একজন ভদ্রলোক। জোগাড় করে পড়ি আর শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করি।

ম্যাগাজিন রুমে ছিল অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে 'ভারতী' ও 'সবুজপত্র'। আর 'মানসী ও মর্মবাণী'। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটে কিন্তু আমাকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে প্রমথ চৌধুরী ও বীরবলের রচনা। তখন তো আমার ধারণা ছিল এঁরা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 'চার ইয়ারী কথা' আমাকে বিলেতে নিয়ে যায়। 'আর্ট' শব্দটা মনে বসে যায়। স্টাইল জিনিসটা আমার কাছে দামী মনে হয়। হেড-মাস্টার মশায় আমার হাতে যদি ম্যাগাজিনরুমের ভার না দিতেন তবে আমি মনে প্রাণে সবুজ হতুম না আর কলেজে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ওড়িয়া সাহিত্যে সবুজ দলের একজন লেখক বলে চিহ্নিত হতুম না। 'পথে প্রবাসে' লিখে অতঃ-

পর প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের স্নেহধন্য হই।

দুটি আকস্মিক ঘটনার উল্লেখ করেছি। তেমনি এক আকস্মিক ঘটনা স্কুলের পুরস্কারস্বরূপ অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে টলস্টয়ের 'টোয়েন্টি-থ্রী টেলস' পাওয়া। ষোল বছর বয়সে তাঁরই একটি উপকথা বাংলায় তর্জমা করে পাঠিয়ে দিই 'প্রবাসী'তে। সঙ্গে সঙ্গে পাই চারু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত পোস্টকার্ড। লেখা মনোনীত হয়েছে। দু'তিন মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। টলস্টয়ের সঙ্গে আমার এই যে সম্পর্ক এটা তখন তো মনে হয়েছিল নিতান্ত সাময়িক। কিন্তু পেছন ফিরে দেখছি টলস্টয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা আমার জীবনের উপরে তথা রচনার উপরে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। তবে সেটা কেবল ওই একটি বই থেকে নয়। কলেজে গিয়ে 'আনা কারেনিনা' পড়ি। দুই টলস্টয়কে মেলাতে পারিনে। তাঁর এই দ্বৈতসত্তা আমাকেও দ্বিধা বিভক্ত করে।

আমি স্থির করেছিলুম সাংবাদিক হব ও আমেরিকায় যাব। তার একটাও আজ অবধি সম্ভব হয়নি। তবে আমেরিকা আমার ঘরণীর রূপ ধরে এসেছেন। সেও এক আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটা আকস্মিক ঘটনা এসে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। রচনারও। কলেজে পড়ার সময় হঠাৎ একদিন প্রেম আসে আমার জীবনে। সাংবাদিকতার জন্যে অপেক্ষা না করে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় বসি। সফল হয়ে বিলেত যাই প্রোবেশনার হিসাবে। এমন সময় আমার বন্ধু কৃপানাথ মিশ্র আমাকে জানায় যে তার ভাগলপুরের প্রতিবেশী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা থেকে 'বিচিত্রা' বলে একটি মাসিকপত্র সম্পাদনা করতে যাচ্ছেন। আমার লেখা চান। হাতে ছিল একটি প্রবন্ধ। পাঠিয়ে দিতেই আবার অনুরোধ আসে। এবার আমি বলি ভ্রমণকাহিনী লিখে প্রবাস থেকে পাঠাব। কার্যত শুরু হয় পথ থেকেই। তাই নাম রাখি 'পথে প্রবাসে'। এটাও আকস্মিক। পরীক্ষায় সাফল্য, ইউরোপযাত্রা, 'বিচিত্রা' প্রকাশ, সাহিত্যিক মহলে প্রবেশ। আশ্চর্য যোগাযোগ।

কিন্তু প্রেম ইতিমধ্যে পলাতক হয়েছিল। আমি মুক্ত। সিভিল সার্ভিসে থাকার কোনো মানে হয় না। তবু থেকে যাই। পাঁচবছর থাকব ও বাংলাদেশের সমস্তটা দেখব। কর্তাদের কাছ থেকে 'বেঙ্গল' চেয়ে নিই। ভালোই করেছিলুম। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ দিকপালদের খুব কাছে আসার সৌভাগ্য হয়। আমার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 'সত্যাসত্য' নামক 'এপিক'

উপন্যাস। তখন তো আমার বিশ্বাস ছিল পাঁচ বছরে পাঁচখণ্ড লিখে আমি খালাস হব। তার পরে আর চাকরি নয়, স্বাধীন জীবিকা। যদি বেঁচে থাকি। সজনীকান্ত দাস তা শুনে বলেছিলেন, "নিজের ভাইট লিটির উপর আপনার এত কম বিশ্বাস!" কী জানি কেন আমার মনে আশঙ্কা ছিল যে আমার পরমায়ু আমার মায়ের মতোই পঁয়ত্রিশ বছর।

সব ওলটপালট হয়ে যায় আর একটি আকস্মিক ঘটনার দরুন। আবার প্রেম। এবার বিয়ে। বিয়ের পরে পুত্রকন্যা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পাঁচ বছরে ফুরোয় না। শেষ করতে বারো বছর লেগে যায়। গৃহিণীর যত্নে স্বাস্থ্যও ভালো হয়। চাকরি ছাড়িনে। অন্তরে অস্বস্তি বোধ করি। স্বধর্ম ও পরধর্ম নিয়ে আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের জিজ্ঞাসার বিরাম ছিল না। উপলব্ধি করি সাহিত্যই আমার স্বধর্ম। সাংবাদিকতাও না, প্রশাসনও না, আইন আদালতও না। কিন্তু অভিমন্যুর ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। পাঁচের জায়গায় দশ বছর হতে যাচ্ছে এমন সময় আর-এক আকস্মিক ঘটনা। পুত্রশোক। পদত্যাগ করতে করতে করা হয় না, করলে আরেক ব্যূহে প্রবেশ করতে হতো। কিন্তু আমার জীবনদর্শনে বেশ একটা পরিবর্তন আসে। সেটা টলস্টয়ের পঞ্চাশ পূর্তির মতো বৈপ্লবিক নয়। তবু সেটা গান্ধীপন্থার অভিমুখেই পদক্ষেপ। লেখার ধরন ধারণও বদলে যায়। ব্রিলিয়ান্ট হওয়া ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিই। সহজ সরল সরস হওয়া আরো শক্ত। এমনি করে আমি জনগণের অভিমুখী হই। ছড়া লিখতে শুরু করি।

অকালে অবসর নিয়ে গ্রামে গিয়ে বসার ইচ্ছা। শান্তিনিকেতন তারই মাঝখানকার ডেরা। পারিবারিক প্রয়োজনে সেইখানেই স্থিতিলাভ করি। একরকম মানিয়ে নিয়েছিলুম গ্রাম ও শহরের সঙ্গমে। নিজের কাজ নিয়ে তন্ময় থাকতে চাই। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের কাজ। 'রত্ন ও শ্রীমতী' তার মধ্যে প্রধানতম। কিন্তু আর একটা আকস্মিক ঘটনা এসে আমার ওই উপন্যাস লেখা থামিয়ে দেয়। দু' খণ্ড লিখেই আমি ক্ষান্তি দিই। সে যে কী অশান্তি তা বলবার নয়। তেরো বছর লেগে যায় মনঃস্থির করতে যে, বেঁচে থাকতে ও বই শেষ করে যাব। নইলে অসমাপ্ত রচনা পেছনে ফেলে রেখে এ জগৎ থেকে অশান্ত চিত্তে বিদায় নিতে হবে। বই যেদিন সারা হয় সেদিন বলি, এখন আমি শান্তিতে মরতে পারি। আমি মুক্ত।

তার পর থেকে দশ বছর কেটে গেছে। এখন নতুন কোনো বৃহৎ উপন্যাসে হাত দেবার বয়স নয়। তবু অন্তরের নির্দেশে আরম্ভ করতে হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশভাগ নিয়ে তৃতীয় এক উপন্যাসমালা। কে জানে শেষ করার জন্যে আয়ু পাব কি না। এতদিন যে আছি এইটেই তো আশ্চর্য। ইতিমধ্যে আরও একটা আকস্মিক ঘটনা আমাকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় টেনে এনেছে, ফিরে যেতে পারছিনে। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের পর দিনকয়েকের জন্যে কলকাতা আসতে হয় আমাকে আব তার মাকে। ফ্ল্যাট থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাই। ফিরে এসে দেখি তিনি পা ভেঙে পড়ে আছেন। হাসপাতাল থেকে ওরা যখন তাঁকে ছেড়ে দেয় তখন বলে বছর দুই কলকাতায় থাকতে। বছর দুই এতদিনে বছর তেরো হয়েছে।

প্রথম যৌবন থেকেই আমি রুসোর দ্বারা অনুপ্রাণিত। বরাবরই চেয়েছি প্রকৃতির সান্নিধ্য। তাই আমার লক্ষ্য শহর নয়, গ্রাম। পাহাড়ের কথাও ভেবেছি, কিন্তু পাহাড়ে তো মানুষকে পাওয়া যাবে না। মানুষকে না পেলে কাকে নিয়ে লিখব, কার জন্যেই বা লিখব? আমি যে সাহিত্যিক। রুসোর জীবনেও দেখা গেল ফ্রান্সের রাজধানী ও সংস্কৃতিকেন্দ্র প্যারিসেই তাঁর অবস্থান। সেখানেই তাঁর জীবিকা। সভ্যতার বিরুদ্ধে যতই যিনি বিদ্রোহ করুন না কেন সভ্যতার নাগপাশ থেকে নিষ্কৃতি নেই। গ্রামও তার প্রভাবে পড়ে দিন দিন শহর হয়ে উঠছে। যেখানে বসে লিখছি সেই ঢাকুরিয়া একদা গ্রাম ছিল। এখন কলকাতা মহানগরীর অঙ্গ। ধানক্ষেত বা জলাজমির উপরে রাশি রাশি অট্টালিকা গজিয়েছে। তার কোনো কোনোটা অত্যাধুনিক, বহুতল। চোখের সামনেই কত বড়ো বড়ো গাছ যে ধ্বংস হলো। সারা দেশ জুড়ে এই ধ্বংসলীলা চলেছে। এ না হলে নাকি সভ্যতার বিস্তার হবে না। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে আমি এর মধ্যে নেই, কিন্তু কথায় আর কাজে সঙ্গতি কোথায়? সঙ্গতির চেষ্টা যতবার করতে যাই ততবার ব্যর্থ হই।

আরো কয়েকটা আকস্মিক ঘটনার উল্লেখ করা উচিত। সাহিত্যিক যদি লিখেই সন্তুষ্ট হতো তা হলে মুদ্রণের প্রয়োজন হতো না, প্রকাশনার আবশ্যক হতো না। কিন্তু এটা কালিদাসের বা চণ্ডিদাসের যুগ নয়। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের যুগ। একালে আমাদের সবাইকে বই লিখে ছাপতে দিতে হয়, তার পর প্রকাশ করতে হয়। ছেলেদের জন্যে যা লিখি 'মৌচাকে' পাঠাই। সম্পাদক সুধীরচন্দ্র

সরকার সাদরে প্রকাশ করেন। সেইসূত্রে যে পরিচয় তা জীবনব্যাপী হয়। কিন্তু তিনিও তো আমার সব বই প্রকাশ করতে পারতেন না। আকস্মিকভাবে আলাপ হয়ে যায় গোপালদাস মজুমদারের সঙ্গে। তিনি চান ছোট একখানা উপন্যাস। প্রথমে নারাজ হই, 'সত্যাসত্য' তখন আরম্ভ করে দিয়েছি, ওদিকে রাজকার্যের দায়। কিন্তু সহসা প্রেরণা পাই, লিখতে বসি 'আগুন নিয়ে খেলা'। গোপালদাসবাবু সানন্দে প্রকাশ করেন, সঙ্গে সঙ্গে রয়ালটির টাকা দেন, সে টাকা এমন কিছু বেশী না হলেও সেটুকু হাতে না পেলে আমার বিয়ে করা হয়তো কঠিন হতো। সাহিত্য থেকে অর্থাগম আমার নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তখন আমি সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছি, ইউরোপ ভ্রমণ করতে গিয়ে সরকারের কাছ থেকে কয়েকমাসের মাইনে আগাম নিয়েছি। সেসব প্রতিমাসেই শোধ দিতে হচ্ছে। গোপালদাসের আবির্ভাব আমাকে সঙ্কটমুক্ত করে। তিনি যখন 'সত্যাসত্য' পাঁচখণ্ড প্রকাশ করতে আগ্রহী হন তখন তো আমি বর্তে যাই। পরে ছয়খণ্ডে সমাপ্ত হয়।

ভ্রমণকাহিনীতেই আমার হাত খোলে ভালো। পাঠকরাও আমার কাছে ভ্রমণকাহিনী চান। প্রকাশকদেরও সেই ইচ্ছা। কিন্তু ভ্রমণ কি আমি নিজের খরচে করতে পারি, কোথায় পাব এত টাকা? ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর আমি আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম যে আবার বিদেশে যাব। কাছাকাছির মধ্যেই বেড়াতে যাই। একবার কালিমপঙে গেছি। হঠাৎ চিঠি পাই, ভারতীয় পি. ই. এন. থেকে আমাকে জাপানে পাঠাতে চায়, সেখানে যোগ দিতে হবে আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. কংগ্রেসের অধিবেশনে। জাপান সম্বন্ধে আমার মোহ ছিল না, কিন্তু নানা দেশের লেখকদের সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? গিয়ে ভালোই করেছি। জাপান এক বিচিত্র দেশ। জাপানীরাও এক বিচিত্র জাতি। লেখকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় তো হলোই, তার চেয়ে বড়ো কথা বৌদ্ধ ধর্ম যে এখনো সগৌরবে জীবিত এটা না দেখলে জীবনের একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থেকে যেতুম। জাপান থেকে ফিরে "জাপানে" লিখি। কী আশ্চর্য! সে বইয়ের জন্যে হঠাৎ পেয়ে যাই 'সাহিত্য আকাদেমি'র পুরস্কার। এটাও আকস্মিক।

পুরস্কারের খবরটা কেমন করে পশ্চিম জার্মানীর কনসাল জেনারেলের দৃষ্টি-গোচর হয়। নিমন্ত্রণ আসে পশ্চিম জার্মান সরকারের তরফ থেকে। সম্পূর্ণ

অপ্রত্যাশিত ভাবে চৌত্রিশ বছর বাদে ইউরোপে ফেরা। জার্মানী ততদিনে ভাগ হয়ে গেছে। পূর্ব জার্মানীতে ফেরা গেল না। তবে পূর্ব বার্লিনে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার অনুমতি পাই। ফেরার পথে লণ্ডন ও প্যারিস দেখি। এই সুযোগ না পেলে আমার পুরাতন বান্ধবীর পুনদর্শন লাভ হতো না। খেদ থেকে যেত। নিয়তি যেন আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে যায়। ক্ষণকালের জন্যে। এও এক ঈশ্বরপ্রেরিত আকস্মিক ঘটনা। ফিরে এসে "ফেরা" লিখি। তার পর আর বিদেশে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই ভ্রমণকাহিনীও আর নয়। দ্বিতীয়-বারের ইউরোপযাত্রা আমাকে তেমন দোলা দেয়নি। যৌবনে যে আমাকে মুগ্ধ করেছিল সে ইউরোপ আর নেই। বারুদের স্তূপের উপর যে বসে আছে সে কি বাঁশি বাজাতে পারে? তেমন বাঁশির সুর আনন্দ দেবে কী করে। 'ফেরা' যে কেন 'পথে প্রবাসে'র মতো হয়নি তার রহস্য এইখানে।

কনিষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূর আগ্রহ আমাকে আমেরিকায় টেনে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু হাতের কাজ শেষ না করে আমি কোথাও যাচ্ছিনে। "ক্রান্তদর্শী" সমাপ্ত না করে আমার ছুটি নেই। অন্তত চারবছরের মেয়াদ। "মেয়াদ" কথাটার আর একটা মানে কারাবাস।

লিখতে যদি হয়

ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে অপাঠ্যপুস্তকই আমাব ভালো লাগত, আমাকে মশগুল করে রাখত। মা দেখতে পেলে বলতেন, "ও কী। বাজে বই পড়া হচ্ছে!" বাবা কিন্তু বাধা দিতেন না। খবরের কাগজ যে আট বছব বযস থেকে আটাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত আমার দ্বিতীয় নেশা হয়েছে এব জন্যে বাবাই দায়ী। সেই সূত্রে আমি যেমন বাংলা শিখেছি তেমনি ইংরেজীও। আব প্রথম নেশা ধরিয়ে দেন আমার ঠাকুবদা। সেটা চাব পাঁচবছর বয়সে। সেটাব ন'ম চা। তখনকাব দিনে চা খুব কম লোকেই খেতো। প্রচারেব জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হতো। সেই প্রথম নেশা আমি এখনো ছাডতে পারিনি। যত বা'র চেষ্টা করেছি ব্যর্থ হয়েছি।

বাবা আমাকে একদিন একটা আলমাবি দিয়ে বলেন, "এখন থেকে এটা তোব জিম্মা থ'কবে। এটাই হবে ল'ইব্রেরী।" বাডীতে যেসব বই ছিল সব বডোদের জন্যে। ইংবেজীব মধ্যে শেক্সপীযাব, বাইবেল, ডিক্‌সন'বী। বাংলাব মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্র নাথ না। তখনো তিনি নোবেল প্রাইজ পাননি। তাঁব ন ম প্রথম শুনি 'মুকুট' নাটক অভিনয়ের সময়। অভিনয় হয়েছিল প্রতিবেশী ব গবাহ দুব দ্ব বকানাথ সবকাবের বাডীতে। অ মাকে দেওয়া হয়েছিল ধুবন্ধবের ভমিকা।

স্কুলের লাইব্রেবী ছিল সেকালের ও সেস্থানের পক্ষে আশাতীত সমৃদ্ধ। সেখানেই আমি রবীন্দ্রনাথেব 'চয়নিকা' অ'বিষ্কাব কবি। মুগ্ধ হয়ে পডি। আবিষ্কার করি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। তাঁর ভক্ত হই। এঁরা অ'মাকে কবিতাব দিকে টানেন। আর গানের দিকে টানেন দ্বিজেন্দ্রলাল, নাটকেব দিকেও। রাজবাড়ীতে তাঁর নাটকের অভিনয় হতো। নাটুকে দলেব সেক্রেটারি ছিলেন বাবা। বারো বছর বয়স হবার আগেই আমার ধারণা দাঁডিয়েছিল যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালই উপন্যাস, কাব্য আর নাটকের তিন দিক্‌পাল।

আমার বারো বছর বয়সে হেডমাস্টার মশায় কী জানি কী দেখে আমাকে কমন রুমের ভার দেন। সেখানে ছিল এনৃতার বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকা।

ক্লাস কামাই করে সেইসব বই পড়ি। সেখানেই আবিষ্কার করি 'সবুজপত্র' ও 'চার ইয়ারী কথা'। সঙ্গে সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর পক্ষপাতী হয়ে পড়ি। মনে মনে বলি, লিখতে যদি হয় প্রমথ চৌধুরীর মতো। কিন্তু গদ্যে। পদ্যে রবীন্দ্র-নাথই আমার আদর্শ। লিখতে যদি হয় রবীন্দ্রনাথের মতো।

ষোল বছর বয়সে আমার হাতে আসে টলস্টয়ের তেইশটি উপকথার ইংরেজী অনুবাদ। স্কুল থেকে পাওয়া পুরস্কার। কোথায় ভারত আর কোথায় রাশিয়া! তবু একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা অনুভব করি। একটি উপকথা বাংলায় তর্জমা করে 'প্রবাসী'তে পাঠাই। অবিলম্বে প্রকাশিত হয়। সেটাই আমার হাতে খড়ি। তখন তো জানতুম না যে টলস্টয়ের সঙ্গে আমার একটা স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হলো। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও। লিখতে যদি হয় টলস্টয়ের মতো, এটা কিন্তু আমি সে বয়সে মনে মনে বলিনি। তাঁর 'আনা কারেনিনা' পড়ি আরো বছর দুই বাদে। যখন আমি কলেজের ছাত্র। আর তাঁর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' পড়ি সাতাশ বছর বয়সে। যখন আমি রাজকার্যে নিযুক্ত। মনে মনে বলি, লিখতে যদি হয় টলস্টয়ের মতো।

আমার তৃতীয় নেশা ছিল দেশ বিদেশে বেড়ানোর নেশা। আট নয় বছর বয়সে আমার স্কুলের সহপাঠী গোলোক আমাকে তার কাকার ফোটো দেখায়। আমেরিকায় তোলা। তিনি সেখানে পড়াশুনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্মও করেন। দেশ থেকে টাকা নিতে হয় না। এটা শুধু আমেরিকাতেই সম্ভব। আরেকটু বড়ো হয়ে বিভিন্ন মাসিকপত্রে আমেরিকাপ্রবাসী অধ্যাপক ও সাংবাদিকদের রচনা পড়ি। সকলেই স্বাবলম্বী। সকলেই কাজ করতে করতে পড়াশুনা করেছেন। পড়াশুনা করতে করতে কাজকর্ম করেছেন। আমিও যদি তাই করি মন্দ কী? স্কুলের লাইব্রেরীতেই ছিল আমেরিকায় প্রকাশিত 'সেলফ এডুকেটর'। তাতে ছিল সাংবাদিকতার কোর্স। পনেরো ষোল বছর বয়সেই সে কোর্স আমি পড়ি। আর ভাবি ওটাই আমার জীবিকা হলে ক্ষতি কী? কোনো মতে একবার আমেরিকায় পৌঁছতে পারলে হয়। কেউ কেউ জাহাজের খালাসী হয়ে বিনা পাসপোর্টে ওদেশে গিয়ে হাজির হয়েছেন। আমিও কি তাঁদের একজন হতে পারিনে? আমার সেই অ্যাডভেঞ্চার কলকাতাতেই থেমে যায়। ফিরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হই। ছোটখাটো একটা স্কলারশিপও জুটে যায়। তার পরে ধাপে ধাপে উপরে উঠেছি, সেরা স্কলারশিপ পেয়েছি।

অবশেষে আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে নিজের উপার্জনে বিলেতে গেছি ও থেকেছি।

আমার দ্বিতীয় নেশাটা কাজে লাগল না। আমি সাংবাদিক হলুম না। কিন্তু তৃতীয় নেশাটা তৃপ্ত হলো ইউরোপে গিয়ে, সেখানকার দৃশ্য দেখে, মানুষের সঙ্গে মিশে, প্রেমে পড়ে। তার থেকেই এলো 'পথে প্রবাসে'। কাব্য নয়, উপন্যাস নয়, ভ্রমণকাহিনীই আমাকে সাহিত্যের আসরে আসন দেয়। দেশে ফিরে প্রমথ চৌধুরীর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন।

ইতিমধ্যে রম্যা রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফের' ইংরেজী অনুবাদ পড়ে সেইরকম কিছু লেখার খেয়াল জেগেছিল। তাঁর উপন্যাস দশ খণ্ডে সমাপ্ত। আমারটা হবে পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে ওটি লিখতে ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হই। ও বই বেশীদূর এগোত না, যদি না সেই সময় আমার জীবনে আসতেন আমেরিকা থেকে তিনি, যাঁর নাম এখন লীলা রায়। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমার ভুলভ্রান্তি তিনিই শুধরে দেন। পদে পদে তাঁর পরামর্শ নিয়েছি। আর পেয়েছি ডি. এম. লাইব্রেরীর গোপালদাস মজুমদারের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা। তখনকার দিনে পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস বাজারে বিকোত না। সেটা ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। তিনিই এ বিষয়ে অগ্রণী। লিখতে লিখতে ছয় খণ্ড হয়ে যায়। বারো বছর লেগে যায়। তাতেও তিনি দমেন না। তাঁর নালিশ কেবল এই যে ও বই সাধারণ পাঠক বুঝবে না, বড্ড বেশী সীরিয়াস। মাঝে মাঝে কমিক রিলিফ চাই। আমি একবার তাঁর কথায় রাজী হয়ে তার পরে বেঁকে বসি। তিনি হাল ছেড়ে দেন। গোপালবাবুকে আগেই বলেছিলুম ও বই থেকে তাঁর লাভ হবে না। লোকসান হতে পারে। তিনি সে ঝুঁকি নেন।

এঁর মতো লিখতে হবে, ওঁর মতো লিখতে হবে, তাঁর মতো লিখতে হবে, আমার জীবনের সেই অধ্যায়টা ক্রমে ক্রমে শেষ হয়ে যায়। তখন আমি স্থির করি যে নিজের মতো লিখব। আমারও তো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। বক্তব্য তো নিশ্চয়ই। লিখনশৈলীও। আত্ম আবিষ্কার লেখকমাত্রেরই জীবনে ঘটে। লেখক তখন আত্মবিশ্বাসে ভর করে দাঁড়ায়। আমার দেশ টলস্টয়ের বা রম্যা রলাঁর দেশ নয়। আমার যুগও রবীন্দ্রনাথের বা প্রমথ চৌধুরীর

যুগ নয়। তাঁরাই বা কেমন করে আমার কাছে আনুগত্য প্রত্যাশা করবেন ? পুত্র কখনো পিতার মতো হয় না। শিষ্য কখনো গুরুর মতো হয় না। তা হলেও একটা পারম্পর্য থাকে। ভুঁইফোড় কেউ নয়। যার কোনো উত্তরাধিকাব নেই সে তার একক প্রতিভার সৃষ্টি দিয়ে হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেটা একবার কি দু'বার। ক্ষণপ্রভার মতো তার প্রতিভাও চমক দিয়ে মিলিয়ে যায়। দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিত্য নতুন কবিতা বা গান বা গল্প বা উপন্যাস কোনো লেখকের হাত দিয়ে হয়নি। রবীন্দ্রনাথও যে প্রতিবারেই বিচিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন তা নয়।

অনেকেই মন্তব্য করেন, "কই, 'পথে প্রবাসে'র মতো হলো না তো ?" তাঁরা আশা করেছিলেন আমি যতবার লিখব ততবাব আশ্চর্য কিছু লিখব। আমি তো জানি আমার অভিজ্ঞতা কত সীমাবদ্ধ। আরও কয়েক বছর বিদেশে থাকলে হয়তো আশ্চর্য কবে দেবার মতো বই লিখতে পারতুম। কিন্তু ইউরোপ যে পথে চলেছিল সেটা শেষপর্যন্ত তাকে যুদ্ধে পৌঁছে দিতই। আমিও অস্বস্তি বোধ করতুম। দুই যুদ্ধের মাঝখানে যেটা সব চেয়ে শান্ত ও সবচেয়ে মধুব সময় সেই সময়েই আমি ইউরোপে ছিলুম। আমার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় ডিপ্রেসন বা মন্দা।

ইউরোপে লক্ষ্য করেছি লেখকদের প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য থাকলেও তাঁবা একটা না একটা গোষ্ঠীভুক্ত। আর সেসব গোষ্ঠীব একটা না একটা মতবাদ ও লিখনরীতি। কেউ বা রিয়ালিস্ট, কেউ বা সুররিয়ালিস্ট, কেউ বা সোশিয়াল রিয়ালিস্ট, কেউ বা রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কারো লেখা নিও ক্লাসিকাল বা নিও-রোমান্টিক। আমাদের এ দেশেও বহু গোষ্ঠী দেখি। কিন্তু সেগুলি হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নয় বাজনীতিভিত্তিক। আমি কলকাতায় থাকলে একটা না একটা দলে ভিড়ে যেতে বাধ্য হতুম, বন্ধুবান্ধবেব টানে। কিন্তু আমাব চাকরি আমাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘোরায়। সেখানে কোথায় সাহিত্য, কোথায় সাহিত্যিক গোষ্ঠী। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসি। এত কম সময় থাকি যে সাহিত্যিক মহলে ঘোরাঘুরি করা হয় না। ফিবে গিয়ে নিজের কাজেই মন দিই। সে কাজ আমার একার। সেই ধরনের উপন্যাস তো আর কেউ লিখতেন না। সুতরাং আমার মন্ত্র ছিল 'একলা চল রে।'

ম্যাজিস্টেট ও জজের কাজে অবসর অতি অল্প। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের

যুগে কাজের চাপ অত বেশী ছিল না। কাজের চাপের চেয়ে কাজের ঝঞ্ঝাট আরো বেশী। একদিকে সন্ত্রাসবাদ, আরেকদিকে সত্যাগ্রহ, আরো একদিকে দাঙ্গা, তার উপরে কৃষক আন্দোলন বা শ্রমিক ধর্মঘট। আমি তো ছুটির দিনেও ছুটি পেতুম না। ছুটোছুটিরও অন্ত ছিল না। প্রায়ই খেই হারিয়ে যেত। কখন যে লিখতুম, কেমন করে যে লিখতুম, কোন্ কোন্ বিষয়ে যে লিখতুম সে অনেক কথা। সে জীবন ছোট খাটো উপন্যাসের পক্ষে প্রতিকূল না হতে পারে, বৃহৎ উপন্যাসের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তেমন কোন উপন্যাস রচনা যেন পর্বতারোহণ।

দায়িত্বপূর্ণ পদে সরকারী চাকরি করতে করতে ও "সত্যাসত্য" লিখতে লিখতে আমার দম ফুরিয়ে যায়। বৃহৎ উপন্যাস হলো দমের কাজ। বলা যেতে পারে ম্যারাথন দৌড়। তার জন্যে চাই দীর্ঘকালের প্রস্তুতি। দৌড় শুরু হয়ে যাবার পরেও প্রস্তুতি চলতে থাকে। সমস্তক্ষণ দম রাখতে হয়। রম্যা রলাঁরও অনেক দিন লেগেছিল। আমার প্ল্যান ছিল আমি পাঁচ খণ্ডে শেষ করব ও তার পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীন লেখক হব। জানতুম না যে এদেশে সেটা সম্ভব নয়, যদি না কেবল উপন্যাস লিখি ও সে উপন্যাস হয় বিনোদনের জন্যে লেখা। একজন মানুষের হয়তো কোনো রকমে চলে যেত, কিন্তু বিয়ের পর চলে না, যদি না স্ত্রীর চাকরি থাকে। ছেলেমেয়ে হবার পর তাদের প্রতি কর্তব্যও বিবেচনা করতে হয়। এমনি করে আমার ইস্তফা বার বার পেছিয়ে যায়। যখন অভিমন্যুর ব্যূহ থেকে বার হই তখন পেনসন পাওনা হয়ে গেছে। বয়সও খুব বেশী হয়নি। সাতচল্লিশ বছর। তা হলেও আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিত। আমার লেখার হাত রায় লিখতে লিখতে আর রিপোর্ট লিখতে লিখতে খারাপ হয়ে গেছে। বাংলা ভাষার সাংবাদিক হলে সে রকম হতো না।

কিন্তু সে রকম খারাপ না হলেও আরেক রকম খারাপ হতো। চটজলদি লেখা পরের ফরমাসে দিনের পর দিন লিখলে লেখার সাহিত্যগুণ খর্ব হতে বাধ্য। সেটা অতিলিখনের অবশ্যম্ভাবী কর্মফল। আমি যে কী ভুল করতে যাচ্ছিলুম তা আমি জানতুম না। সাংবাদিকতার নেশা আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করত। বাঙালী সাংবাদিকদের মধ্যে আমার আদর্শ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যুদ্ধের সময় যখন তিনি বাঁকুড়ায় আশ্রয় নেন তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। একদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "সাহিত্যে আমার কোন দান নেই। আমি

কিছু দিয়ে যেতে পারলুন না।" আমি আশ্চর্য হই। তা হলে কি সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার সপত্নী সম্পর্ক। একজনকে তুষ্ট করলে আরেকজন রুষ্ট হয়। ইউরোপেও দেখা যায় সাহিত্যের উপার্জন অকুলান হলে সংবাদপত্রে লিখে সংসার চালাতে। সেসব রচনা সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। তবু অর্থকরী। কিন্তু রামানন্দবাবুর সাহিত্যে দান না থাকাটা অত্যন্ত দুঃখের। একই দুর্ভাগ্য হয়েছিল বিপিনচন্দ্র পালের। তাঁর মতো সাংবাদিক ভারতে দুর্লভ। কিন্তু সাহিত্যে তিনি যা দিয়ে গেলেন তা কি স্মরণযোগ্য ?

সরকারী পদে যতদিন ছিলুম ততদিন আমি নিজেকে অপরাধী মনে করেছি। কারো প্রতি কোনো অন্যায় করেছি বলে নয়, নিজের ব্রত থেকে সরে গেছি বলে। কিন্তু এখন খতিয়ে দেখছি ওর বিকল্প যা ছিল তা হতো আরো ক্ষতিকর। আর কিছু না পারি আমি "সত্যাসত্য" লিখতে পেরেছি। সেটা কি সাংবাদিকতা করতে গেলে সম্ভব হতো ? অপরের পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে। আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে চাকরিতে থাকলে ওর মতো আর কোনো বৃহৎ উপন্যাসের জন্যে দম থাকত না। চাকরির দাবী ক্রমেই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছিল। সাহিত্য আমি ছেড়ে না দিলেও সাহিত্যই আমাকে ছেড়ে দিত। লক্ষ্মীছাড়া না হয়ে আমি হতুম সরস্বতীছাড়া। তখন হঠাৎ একদিন স্ত্রীকে একটা আধুলি ধরিয়ে দিয়ে বলি, "টস্ করো। যদি মাথা ওঠে তবে পদত্যাগ। নয়তো স্থিতি।" মাথাই ওঠে। তখন পদত্যাগপত্র তাঁকেই দিয়ে টাইপ করাই। এমন সহধর্মিণী ক'জনের হয় !

স্বগত

"আমি বহু বাসনাবে প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করি বাঁচালে মোরে। এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবনে ভবে।" কবিগুরুর এই উপলব্ধি আমার জীবনেও সত্য। ষোল বছর বয়সে আমি আমার জীবিকা হিসাবে বেছে নিই জার্নালিজম, পরে যার পারিভাষিক শব্দ হয়েছে সাংবাদিকতা। হওয়া উচিত ছিল পত্রকার পেশা। কথা ছিল আমি কলকাতা থেকে জাহাজের খালাসী হয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেব ও সেখানে জার্নালিস্ট হয়ে অর্থোপার্জন আর কলেজে গিয়ে বিদ্যা অর্জন করব। যেমন করেছিলেন তারকনাথ দাস, সুধীন্দ্র বসু, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, সন্ত নিহাল সিং। এর জন্যে আমার প্রস্তুতিও ছিল আট নয় বছর বয়স থেকে। বাবা আমাকে পড়তে দিতেন সাপ্তাহিক 'বসুমতী' ও 'বেঙ্গলী'। পরে হেডমাস্টার মশাই দেন স্কুলের ম্যাগাজিন রুমের চাবী। তন্ময় হয়ে পড়ি 'ভারতী' 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'গৃহস্থ' প্রভৃতি মাসিকপত্র। তাঁর বাসায় গিয়ে চেয়ে আনি 'প্রবাসী'। বন্ধুদের কাছে পাই 'ভারতবর্ষ' ও পরে 'নারায়ণ'। স্কুল থেকে নেওয়া হতো 'মাই ম্যাগাজিন', 'চিলড্রেন্‌স নিউজ-পেপার'। খাস বিলাতী পত্রিকা। এই কোম্পানীর 'চিলড্রেন্‌স এনসাই-ক্লোপীডিয়া'। পরে যার নাম হয় 'বুক অফ নলেজ'। একই রকম গ্রন্থ 'সেলফ এডুকেটর'। আমেরিকায় প্রকাশিত। তাতে ছিল জার্নালিজমের উপর প্রতি খণ্ডে একটি করে প্রবন্ধ। রিপোর্টার, সাব-এডিটার, এডিটর এঁদের কার কী রকম দায়িত্ব। আমি হতে চাই এডিটর। লিখতে চাই সম্পাদকীয় নিবন্ধ। তাও ইংরেজী ভাষায়। কেন লিখতে পারব না? আমি কি নিয়মিতভাবে 'মডার্ন রিভিউ' পড়িনি? অনিয়মিতভাবে বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদিত 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' ও 'ডেমোক্রাট', অ্যানি বেসান্টের সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'কমনউইল', অন্যান্যদের সম্পাদিত 'বম্বে ক্রনিকল্' 'অ্যাডভোকেট অব ইণ্ডিয়া', 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট', 'পাইওনিয়ার' ইত্যাদি পত্রিকা! 'টেলিগ্রাফ' বলে একটি সাপ্তাহিক ছিল। নিজেই ছিলুম তার গ্রাহক। 'প্রবাসী'রও।

কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়ে কলকাতা গিয়ে দেখি সম্পাদকরা আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় চান না। 'বসুমতী' সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পরামর্শ দেন শর্টহ্যাণ্ড

ও টাইপরাইটিং শিখতে। 'সার্ভ্যান্ট' সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বলেন প্রুফ রীডিং শিখতে। কিছুদিন ঘোরাঘুরি করার পর বুঝতে পারি যে অত সহজে জার্নালিস্ট হওয়া যায় না। দীর্ঘকাল তপস্যা করতে হবে। ওদিকে জাহাজের খালাসী হওয়া কি মুখের কথা? শরীরে সামর্থ্য কোথায়? পাইস হোটেলে বা হালওয়াইয়ের দোকানে খেয়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল। এমন সময় কাকার চিঠি পেয়ে কটকে যাই। "কলেজ খুলে গেছে। তোমার বন্ধুরা সবাই ভর্তি হয়েছে। তুমি আমাদের বংশের বড়ো ছেলে। আমরা কত আশা করেছিলুম। তুমি ফিরে এস।" সহযোগী প্রুফরীডারও বলেন, 'আপনি যদি এ লাইনে আসতে চান তো আগে বি-এ পাশ করুন।"

আগে বি-এ পাশ করার জন্যে ইংরেজদের গোলামখানায় ভর্তি হয়ে আমার সে কী পরিতাপ! সেটা অসহযোগের আমল। পড়াশুনায় মন বসে না। জেলে যাবার তোড়জোড় করি সবান্ধবে। মহাত্মাজী যখন বারডোলী সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখেন তখন পড়াশুনায় মন দিই। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকে। বাইরের পড়াশুনায় আমার কমতি ছিল না। কটক কলেজের বিরাট লাইব্রেরীতে গিয়ে কন্টিনেন্টাল লিটারেচারের বই ধার করা ছিল আমার নিত্যকর্ম। টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনেভ, ইবসেন, ব্যোর্নসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, হাউপ্টমান, মেটারলিঙ্ক, আনাতোল ফ্রাঁস, রম্যা রলাঁ, এইচ জি ওয়েলস, বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় কলেজে না গেলে খবরের কাগজের দফতরে বসে হতো না। কলেজের লাইব্রেরীতে এদের বই থরে থরে সাজানো রয়েছে দেখে ভাবি আমি যদি সাহিত্যিক হতুম তা হলে আমার বইও এদের মতো এদেরই সঙ্গে সাজানো হতো। এমনি ক্লাসিক হতো। আমার আসন হতো একসারিতে।

আমরা কয়েকজন সহপাঠী মিলে একটা সাহিত্যিক গ্রুপ গঠন করি, পরে সেটারই নাম হয় সবুজ দল সেই থেকে সবুজ যুগ। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বিংশ শতকের একটি অংশ সবুজ যুগ নামে চিহ্নিত। নামটি সম্ভবত 'সবুজপত্র' থেকে নেওয়া। সম্ভবত আমার 'সবুজপত্র' প্রীতি থেকে। ইউরোপের কোনো একটি দেশের সাহিত্যেও একদল লেখক ছিলেন, তাঁদেরও পরিচয় 'সবুজ' বলে। তাঁদের ব্রত ছিল সাধারণ লোকের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করা। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত 'সবুজপত্র' কেবল কথ্যভাষার অভিযানের ভ্যানগার্ড হয়েই ক্ষান্ত ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল

পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের মিলন, স্বদেশের সঙ্গে স্বকালের মিলন, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের মিলন। সেই বারো বছর বয়স থেকেই আমি 'সবুজপত্র'-এর কল্যাণে পশ্চিমমুখী ও স্বকালমুখী। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজী ভাষায় লেখা সাহিত্যের বই, ইতিহাসের বই, ভূগোলের বই আমি বড়ো কম পড়িনি। পুরস্কার পেয়েছি একাধিকবার। অপর পক্ষে বারো বছর বয়সের আগেই আমার পড়া হয়ে গেছল কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। বাড়ীতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বাবা আবৃত্তি করতেন আরতির সময় বিদ্যাপতির পদ আর মা গাইতেন জয়দেবের গীতগোবিন্দের গীত। শুনতে শুনতে আমার ছন্দের কান, মিলের কান তৈরি হয়ে যায়। অর্থ বুঝি না বুঝি, ছন্দ ও মিল ভালো-বাসি। বারো বছর বয়সের পরে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্র-নাথ প্রভৃতির কবিতা যে আমার প্রিয় ছিল তার কারণ প্রধানত ছন্দ ও মিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাতের কারণ ছিল তাঁর কবিতার মিষ্টিক বা মরমিয়া সুর। আমার নিজের ব্যক্তিসত্তাতেও ছিল মিষ্টিক উপাদান। একবার বছর চোদ্দ পনেরো বয়সে ও আরেকবার উনিশ কুড়ি বছর বয়সে আমার জীবনে আশ্চর্য এক মিষ্টিক উপলব্ধি ঘটে। হঠাৎ আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। আমি ক্ষণকালের জন্যে ক্ষণপ্রভার আলোকে দ্যুলোক ভূলোক দর্শন করি। এই আলোককেই কি ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলছেন, "The light that never was on land or sea?" এ রকম উপলব্ধি আগে বা পরে কখনো না ঘটলেও ছেলেবেলা থেকেই আমার সত্তায় ছিল ইনটুইশনের একটা ভাগ। তুলনায় ইন-টেলেকটের ভাগ কম। কলেজের সতীর্থদের সঙ্গে প্রাণপণ প্রতিযোগিতায় নেমে অত্যধিক ইনটেলেকটের চর্চা করি। এ চর্চা আমাকে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য এনে দেয়, কিন্তু সেই অনুপাতে আমার স্বভাবগত ইনটুইশনের ক্ষতি করে। নিজের চেষ্টায় আমেরিকা যাওয়া হয় না, কিন্তু নিজের জোরে ইউরোপযাত্রা ঘটে। এইভাবে আমার একটি বাসনা পূর্ণ হয়। পশ্চিমযাত্রার বাসনা। কিন্তু আমেরিকা যাত্রা এ জীবনে এখনো অঘটিত। আমেরিকা না গেলেও আমেরিকা আমার ঘরে আসেন। সে ঘটনা ইউরোপ থেকে ফেরার পরে। ততদিনে আমি বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন আই-সি-এস অফিসার। জার্নালিজম ততদিনে হাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু 'পথে প্রবাসে'র সূত্র ধরে

সাহিত্য আমার জীবনে থাকতে এসেছে। কী করে তাকে জায়গা দিই সেই আমার প্রাত্যহিক ভাবনা। সফল অফিসার হতে চাইলে সার্থক সাহিত্যিক হওয়া চলে না। আবার সার্থক সাহিত্যিক হতে চাইলে সফল অফিসার হওয়া চলে না। অথচ সার্থক সাহিত্যিক না হয়ে আমার জীবনের সার্থকতা নেই। আমি যে চেয়েছি বিশ্বের সাহিত্যিকদের সঙ্গে একসারিতে বসতে।

দেশে ফিরে এসে আমি হাত দিই 'সত্যাসত্য' নামক পাঁচ খণ্ডের একটি বৃহৎ উপন্যাসে। আমার কল্পনার মহৎ উপন্যাসে। রলাঁর যেমন 'জাঁ ক্রিস্তফ'। পরে সেটি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হয়। বারো বছর সময় নেয়। ততদিনে আমার বয়স আটত্রিশ। সালটা ১৯৪২। কথা ছিল এ বই পাঁচ বছরের মধ্যে পাঁচ খণ্ডে শেষ করে চাকরিতে ইস্তফা দেব ও আবার জার্নালিজমে ফিরে যাব। স্বদেশে অথবা বিদেশে। কিন্তু লিখতে লিখতে পুঁথি বেড়ে যায়, চাকরি করতে করতে পদোন্নতির নেশায় পেয়ে বসে। ইতিমধ্যে বিবাহ করেছি, পুত্রকন্যা হয়েছে। তার আগে মনঃস্থির করা যত সহজ ছিল পরে তত সহজ নয়। গড়িমসি করতে করতে বছরের পর বছর কেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মনের জোরও কমে যায়। চাকরি কি না ছাড়লেই নয়? চাকরিতে থেকেও তো বঙ্কিমচন্দ্র অমর হয়েছেন। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা জানে শ্যাম আর কুল দুই রাখা যায় না। শ্যামের জন্যে কুল ছাড়তে কষ্ট। কুলের জন্যে শ্যাম ছাড়তে কষ্ট। একদিন না একদিন আমাকে চাকরির মায়া কাটাতেই হবে। আর নয়তো আমি হব একজন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর লেখক। বঙ্কিমের প্রতিভা আমার নেই। আমার যা আছে তা আমার উপলব্ধির ভাণ্ডার। সে ভাণ্ডার সাহিত্যে উজাড় করতে হলে আরো সময় চাই, আরো একাগ্রতা চাই, আরো স্বাধীনতা চাই। চাকরিতে থেকে এর একটাও পাব না।

মনের এই দোলায়মান অবস্থায় আমার একটি পুত্রকে হারাই। তখনি হৃদয়ঙ্গম করি যে ভুল পথে এসেছি ও চলেছি। ঐশ্বর্যের পথ আমার পথ নয়। অন্যান্য আই-সি-এসদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমি এই বিপদ ডেকে এনেছি, এ আমার স্বখাত সলিল। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এ পথ ছাড়তে হবে। তার পর যা থাকে কপালে। শোকটা প্রশমিত হলে আর একটু ভেবে দেখি যে ও পথও আমার পথ নয়। ওই যে জার্নালিজমের পথ ওপথে গেলে সাহিত্যের জন্য আরো কম সময় পাব। আরো কম একাগ্রতা।

এমন কি আরো কম স্বাধীনতা। নিজের তো মূলধন নেই। যাঁর পত্রিকায় যোগ দেব তিনিই তো ফরমাস দিয়ে লিখিয়ে নেবেন। তা হলে আর স্বাধীনতা কিসের? সরকার আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেন না। আমার লেখায় বাধাও দেন না। সরকারের সমালোচনা না করলেই হলো। একবারমাত্র তাঁরা আমার রশ টেনে ধরেছিলেন। বিলেতে থাকতে হাই কমিশনারের এডুকেশনাল অ্যাডভাইজার আমাকে ডেকে পাঠান। বলেন, "বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট মাসিকপত্রে আপনার লেখা পড়ে অস্বস্তি বোধ করছেন। মাসিকপত্রে আপনি যদি কিছু লিখতে চান ছদ্মনামে লিখবেন।" 'পথে প্রবাসে' ততদিন শেষ হয়ে এসেছিল। স্বনামেই সেটা শেষ করে লীলাময় রায় নামে 'সত্যাসত্য' আরম্ভ করি। কিন্তু বই যখন ছাপা হয় তখন স্বনামেই ছাপা হয়। সরকার আপত্তি করেন না। লীলাময় রায়ও পরে মাসিকপত্র থেকে অন্তর্হিত হন। কেউ কিছু মনে করেন না। আমিও বুঝতে পারি যে সরকারী চাকরিতে থেকে সরকারের অস্বস্তি ঘটানো চলে না। আমার বাকস্বাধীনতাও সেই পরিণামে সসীম।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা আরো গভীর স্তরের। প্রথমত, প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে, দ্বিতীয়, আধুনিক ইউরোপের সম্বন্ধে আমার মোহ বলতে খুব বেশী অবশিষ্ট ছিল না। প্রেরণার জন্যে আমাকে তাকাতে হচ্ছিল তৃতীয় একটা দিকে। সেটা বিপ্লবী রাশিয়া। কিন্তু স্টালিনের মতো হাজার হাজার মানুষকে নিপাত না করলে ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দীদাস না করলে মর্ত্যভূমিতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এই নিষ্ঠুর সত্যের মধ্যেও আমি প্রেরণার সন্ধান পাইনে। তখন আমি ফিরে যাই গান্ধীজীর কাছে, টলস্টয়ের কাছে, রুশোর কাছে, রাসকিনের কাছে, থোরোর কাছে। প্রকৃতির কাছে, পল্লীর কাছে, কৃষি ও কারুশিল্পের কাছে, লোকগীতি ও রূপকথার কাছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কাছে। ইনটুইশন ও মিস্টিসিজমের কাছে। এসব বাদ দিলে সভ্যতারই বা কতটুকু মূল্য! প্রগতিরই বা কতটুকু মহিমা? কিসের এত অহঙ্কার, যখন মহাযুদ্ধের পর মহাযুদ্ধ এসে সাজানো বাগান ধ্বংস করে দিয়ে যাচ্ছে? বিপ্লবের পরেই বা সাহিত্যের ঘরে, শিল্পের ঘরে, সৌন্দর্যের ঘরে কতটুকু জমল?

আমার জীবনের সঙ্গে আমার রচনার সম্পর্ক অতি নিবিড়। রচনাকে জীবনের সঙ্গে আর জীবনকে রচনায় সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে আমি অনবরত চেষ্টা করছি। ভুল পথে এতদূর এসেছি ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়, অথচ সব

ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যকেই জীবনোপায় করতে সাহস হয় না। সে সাহস ছিল যামিনী রায়ের। চিত্রকলায় তিনি যে ধারা অবলম্বন করেছিলেন সাহিত্যে আমিও সেই ধারা অবলম্বন করতে চাই। লোকসাহিত্যের আদলে গল্প লেখা, কবিতা লেখা। যা চিরকালের লোকসাহিত্যের সঙ্গে মিশ খাবে। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে বাংলা ছেলেভুলানো ছড়ার যে রেকর্ড বেরিয়েছে তাতে আমারও একটি ছড়া ঠাঁই পেয়েছে। শুনবে যারা তারা ঠাওরাবে এটিও একটি চিরকেলে ছড়া। সাধ তো ছিল নতুন পদাবলী রচনা করার। যা বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে মিশে যেত। রবীন্দ্রনাথের গান যেমন ছাপার অপেক্ষা রাখে না, গায়কগায়িকাদের কণ্ঠে ভর করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভেসে বেড়াবে, আমার ছড়াও কি তেমনি গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে পারবে ?

সাধ ছিল শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বসত করার। সকলের সঙ্গে একাত্ম হবার। অবিকল টলস্টয়ের স্বপ্ন। এ স্বপ্নের অঙ্কুর ষোল বছর বয়সে তাঁর 'তেইশটি উপকথা' পুরস্কার পাবার সময় থেকেই মনের কোণে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার এক হাত ধরে টানছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা তার প্রখ্যাত পীঠস্থানে, আরেক হাত ধরে টানছিল কৃষিভিত্তিক কারুশিল্পভিত্তিক প্রাচ্য সভ্যতা তার নামহীন পল্লীকুটিরে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব থেকেই আমাদের বাড়ীতে আমরা গ্রাম্য তাঁতীর হাতে বোনা কাপড়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলুম। পরে আমার বাবা খাদি পরতে শুরু করেন। আমিও। চরকা নিয়েও নাড়াচাড়া করেছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি একমত নই যে চরকায় সুতো কাটলে মন কাটা যায়। আবার গান্ধীজীর সঙ্গেও আমি একমত নই যে সরকারী ধাঁচের স্কুল কলেজে পড়লে দাস মানসিকতা জন্মায়। কায়িক শ্রমের উপর অনীহা ছিল, তাই গান্ধীজীর শিক্ষা অমান্য করি কিন্তু খাদি আমি কোনোদিন ছাড়িনি, যদিও ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর আমি গান্ধীজীর দিকেই বেশী করে ঝুঁকি। আবার তিনিও রবীন্দ্রনাথের দিকে ধীরে ধীরে ঝোঁকেন। অবশেষে বলেন, "গুরুদেবের সঙ্গে আমার আদৌ অমিল নেই।"

স্বাধীনতার পরে আমার অকালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে এবং সেখান থেকে গ্রামে চলে যাবার পরিকল্পনা ছিল। মুক্তি পেয়ে সত্যি সত্যি একদিন শান্তিনিকেতনে বাস করি। কিন্তু দ্বিতীয় পদক্ষেপটি আর নেওয়া হয় না। ষোল বছর বাদে আবার ফিরে আসি কলকাতায়, মাত্র তিনদিনের জন্যে, কিন্তু

এক দুর্ঘটনায় পড়ে আমার স্ত্রী জখম হন। তিন দিন পরিণত হয়েছে তেরো বছরে। এখনো আশা আছে ফিরে যাবার। কিন্তু পল্লী পর্যন্ত যাওয়া বোধহয় এ বয়সে সম্ভব নয়। বয়স এখন ছিয়াত্তর। সাহিত্যের আদর্শও ইতিমধ্যে বদলেছে। আমার জীবনের সত্য আমি সাহিত্যের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে চাই। সাহিত্য বলতে আমি বুঝি শুধুমাত্র জনগণের বোধগম্য লোকসাহিত্য নয়। হোমার বাল্মীকি কালিদাস শেকসপীয়ার দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রদর্শিত পন্থায় গতিমান যে সাহিত্য, আমি বুঝি সেই মার্গ সাহিত্যকেও। এর একটা ক্লাসিক্যাল ভিত্তি থাকবে। আর থাকবে আধুনিক চূড়া। লোকসাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় ও গভীর সম্পর্কও থাকা চাই। আর জনগণকেও দূরে রাখা চলবে না। কিন্তু তারাই একমাত্র ভোক্তা হবে, এটা যেমন একপ্রকার গোঁড়ামি, তেমনি তাদের জীবনই হবে একমাত্র উপজীব্য এটাও একপ্রকার ডগমা। নীতিবিদদের আর্ট সম্পর্কিত ধারণাও শিল্পীকে নীতির নিগড়ে বেঁধে রাখতে চায়। সাহিত্য অবন্ধন। তা বলে নীতিবর্জিত নয়। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার নীতি। সৌন্দর্যের আধারে স্থিতিও হচ্ছে তার নীতি। তাকে দিয়ে কি মানবাত্মার কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণ হতে পারে?*

জিজ্ঞাসা

বারো বছর বয়সে আমার হাতে পড়ে একতাড়া 'সবুজপত্র'। প্রমথ চৌধুরী বা আর কারো রচনায় পাই 'আর্ট' বলে একটি বিদেশী শব্দ। শব্দটি আমার মনে গেঁথে যায়। সেই বয়স থেকেই শুরু হয় আমার 'আর্ট' জিজ্ঞাসা। প্রাচীন ভারতের ঋষিপুত্রদের যেমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা আমাকে পরে নিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে। আরো পরে রম্যাঁ রলাঁর কাছে। যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি তেমন জীবিত ও মৃত বহু পূর্বসূরীর কাছে। কী স্বদেশে কী বিদেশে। বস্তুত এ জিজ্ঞাসার বা এ মীমাংসার দেশবিদেশ নেই। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মতো এটাও সার্বত্রিক ও চিরকালীন। আমার এ জিজ্ঞাসা এখনো অনির্বাণ। যখনি নতুন কিছু লিখতে যাই তখনি নতুন করে ভাবতে বসি কেমন করে লিখলে আর্ট হবে।

কেমন করে লিখব এটাও যেমন একটা প্রশ্ন তেমনি আর একটা প্রশ্ন কী লিখব। এর নাম সত্যজিজ্ঞাসা। আর্টজিজ্ঞাসার মতো এটাও আমার জীবন-ব্যাপী জিজ্ঞাসা। এর জন্যেও আমাকে যেতে হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকদের কাছে, বিভিন্ন দেশের পাঠাগারে, বিভিন্ন বয়সের জ্ঞানীগুণীদের সন্নিধানে। মিশতে হয়েছে নানা স্তরের নানা জনের সঙ্গে। খাটতে হয়েছে আপিসে আদালতে। ছুটতে হয়েছে সংঘর্ষের স্থলে। দেখতে হয়েছে ঘাতপ্রতিঘাতের চিহ্ন। হাতীর পিঠে ঘোড়ার পিঠে মানুষের পিঠে চড়ে বেড়াতে হয়েছে। আর্ট আপনাকে নিয়ে আপনি সম্পূর্ণ নয়। পার্বতীর যেমন পরমেশ্বর, বাক্-এর যেমন অর্থ, আর্টের তেমনি সত্য। আবার সত্যেরও তেমনি আর্ট। সত্য অবশ্য আপনাকে নিয়ে আপনি সম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তেমন নিরালম্ব সত্য মানুষের জন্যে নয়। আর্ট হচ্ছে সেই আধার যা সত্যকে ধারণ করে একযুগ থেকে আরেক যুগে ও এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায়। রামায়ণ মহাভারত লেখা না হলে কেই বা জানত রামরাবণের কথা বা কৌরবপাণ্ডবের কাহিনী? ইলিয়াড অডিসি লেখা না হলে প্রাচীন গ্রীসের উপাখ্যান? সাহিত্যের অন্তঃসার হচ্ছে সত্য, তার দেহ হচ্ছে আর্ট।

ক্রমে ক্রমে আমিও একজন সাহিত্যিক হয়ে উঠি। বছর পঞ্চাশ বয়সে একদিন হঠাৎ অনুভব করি যে অন্তঃসৌন্দর্য না থাকলে অন্তঃসারও যথেষ্ট নয়। তখন থেকে এটাও আমার জিজ্ঞাসা। তৃতীয় এক জিজ্ঞাসা। অন্তঃসৌন্দর্য কী? কোথায় পাব তারে?. সে কি আছে বিষয়বস্তুর মধ্যে, না আমার আপনার ভিতরে? এ জিজ্ঞাসা এখনো অমীমাংসিত। এখন আমার বয়স ছিয়াত্তর।

জন্মাবধি আমি দুর্বল। দুবল মায়ের প্রথম সন্তান। আমার ধারণা ছিল আমিও আমার মায়ের মতো পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মর্ত্য থেকে বিদায় নেব। বাল্যকাল থেকে আমি বিদেশী সাহিত্য পড়ে রোমান্টিক। আমার বাসনা ছিল আমিও শেলী, কীটস্, বায়রনের মতো যৌবনেই ঝরে পড়ব। তার আগে শেষ করে যাব আমার জীবনের কাজ। আমার রোমান্টিক কবিতা। তখন তো জানতুম না যে জীবনদেবতা আমার হাত থেকে কাব্যের বাঁশরি কেড়ে নিয়ে গদ্যের গদা ধরিয়ে দেবেন। 'পথে প্রবাসে' লিখে যখন নাম হয়ে যায় 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে। উৎসাহ পেয়ে লিখতে বসি 'সত্যাসত্য'। ওটি আমার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কিন্তু লিখতে লিখতে লেগে যায় দ্বাদশ বর্ষ। ততদিনে আমি আর রোমান্টিক কবি নই, আমি ইনটেলেকচুয়াল ঔপন্যাসিক। আশ্চর্যের বিষয় তখনো আমি মায়ের অনুগামী হয়নি। ইতিমধ্যে সাবিত্রী এসে সত্যবানকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনার ভার নিয়েছেন। তাঁর আগমনও আকস্মিক।

'সত্যাসত্য' যখন শেষ হয়ে গেল তখন আমি আমার জীবনের রোমান্টিক পর্ব অবলম্বনে আরো একখানি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করি। আবার এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কিন্তু দেশের উপর দিয়ে যুদ্ধ আর সত্যাগ্রহ আর দাঙ্গাহাঙ্গামার ঝড় বয়ে যায়। তার জের চলে স্বাধীনতার পরেও। লিখব কখন? আর লিখতে দিচ্ছে কে? অকালে অবসর নিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে যাই। তার নাম শান্তিনিকেতন। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি লেখার হাত নষ্ট হয়ে গেছে। লেখকের পক্ষে এর মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। অর্থ সে পেনসন থেকে পেতে পারে। অবসর সে আপিস আদালতে না গিয়ে পেতে পারে। কিন্তু লেখার হাত যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে

সে নিরুপায়। তাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। বছর কয়েক কেটে যায় সরস্বতীকে প্রসন্ন করতে। লিখতে বসলুম সেই রোমান্টিক উপন্যাস, কিন্তু বাধা এল অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। লেখা থেমে গেল মাঝখানে। আরো পাঁচ রকম বই লিখে সময় কাটিয়ে দিই। শেষে অন্তর থেকে অভয় মেলে। 'রত্ন ও শ্রীমতী' সারা হয়। তখন আমার বয়স ছেষট্টি। ভেবেছিলুম একষট্টি বছর বয়সে বাবার অনুগামী হব। সেটাও পার হয়ে গেল।

এখন আমি আরো একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস নিয়ে ব্যাপৃত। এর প্রস্তুতি চলেছে দশ বছর ধরে। কবে সমাপ্ত হবে জানিনে। এটাও একটা অবশ্যকরণীয় কাজ। আশা করি আয়ু ততদিন থাকবে।*

*বিদ্যাসাগর পুরস্কার উপলক্ষে ভাষণ

সৃষ্টির মূল উপাদান

আজ আমার 'হরিষে বিষাদ'। হর্ষ এইজন্যে যে এ পুরস্কার আমার পিতৃবন্ধু ও বাল্যপ্রতিবেশী স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের নামাঙ্কিত। বিষাদ এই জন্যে যে এ পুরস্কারের প্রবর্তক স্বর্গীয় অশোককুমার সরকার ছিলেন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহপাঠী ও আমার ভ্রাতৃপ্রতিম। বাবুয়া বলেই আমরা তাঁকে ডাকতুম। বাবুয়াকে যখন প্রথম দেখি তখন তার বয়স বছর তিনেক। সাত আট বছর পরে বাবুয়ারা ঢেঙ্কানাল থেকে বিদায় নেয়। আমারও স্কুলের পড়া শেষ হয়েছিল। আমিও অন্যত্র গিয়ে কলেজে পড়ি। তখনকার দিনে আনন্দ-বাজার পত্রিকা ছিল একখানি ধর্মীয় সাপ্তাহিক। আমাদের বাড়ীতে তার আগাগোড়া লাল কালিতে ছাপা দোল সংখ্যা দেখেছি। সেই পত্রিকাই প্রফুল্ল কুমারের পরিচালনায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। পরে তাঁর পুত্রের পরিচালনায় ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছে। কীর্তির্যস্য স জীবতি। আনন্দবাজার পত্রিকা যতদিন জীবিত থাকবে এই দুই কীর্তিমান পুরুষও ততদিন জীবিত থাকবেন। এই পুরস্কার আমার কাছে তাদের দু'জনেরই স্মারক। আমি কৃতার্থ।

স্মারক শুধু তাঁদের দু'জনেরই নয়। আমার বাল্য ও কৈশোরের সেই সাত আটটি সোনালী বছরেরও। তখন কে জানত যে আমি একদিন সাহিত্যিক হয়ে উঠব! আমি তো জানতুম না। বাবা আমাকে দেন একটা আলমারীর চাবী। তার মধ্যে ছিল প্রচুর বাংলা ও ইংরেজী বই, প্রাচীন ও আধুনিক। হেড মাস্টার মশাইও আমাকে দেন কমন রুমের আলমারীর চাবী। সেখানে একরাশ মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা। বাংলা ও ইংরেজী। এ ছাড়া স্কুলের লাইব্রেরীতেও ছিল আমার অবাধ প্রবেশ। ইংরেজী, বাংলা, ওড়িয়া বইতে ভরা কয়েকটি আলমারী। অতি পুরাতন ও অতি নূতন। আরো কয়েক জনের প্রাইভেট লাইব্রেরী থেকেও আমি বইপত্র পড়তে পেতুম। বেশ মনে আছে একখানি বইয়ের ভেতরে লেখা ছিল 'নির্ঝরিণী সরকার'। মানে বাবুয়ার মা, আমার বন্ধু মনোরঞ্জনের 'ঝুন্নি দিদি'। ঝুন্নি দিদি একদিন চমকে ওঠেন। 'ওমা, এইটুকু ছেলে 'রাজসিংহ' পড়বে!' সেইটুকু ছেলে তার আগেই বঙ্কিম

পড়েছিল। তবে বুঝতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ।

কপিলাস পাহাড়ে শিবরাত্রি উপলক্ষে সদর থেকে যাঁরা যান তাঁদের রাত কাটানোর জন্যে রাজা সাহেবের শৈলাবাসের একখানা হল ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়। মেজেতে বিছানার উপর প্রফুল্লবাবুর একপাশে শোন বিখ্যাত বৈষ্ণব কুমুদবন্ধু সেন, আরেক পাশে অখ্যাত কিশোর—কে বলুন তো? তাঁর অপর এক বন্ধুর ইচড়ে পক্ক পুত্র। তাঁদের কথাবার্তার কতক অংশ এখনো আমার মনে আছে। পঁয়ষট্টি বছর পরেও তাঁদের আলোচ্য ছিল 'নারায়ণ' মাসিকপত্রে প্রকাশিত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ। 'নারায়ণ' আমি দেখেছিলুম। তাতে প্রফুল্লকুমার সরকার বলে একজন লিখতেন। তিনি কি ইনি না আর কেউ? এবার মনে হলো বোধহয় ইনিই। কুমুদবাবু, প্রফুল্লবাবু, মনোরঞ্জনের বাবা রাখালবাবু ও আমার বাবা নিমাইবাবু সন্ধ্যাবেলা মিলিত হতেন পার্বতীবাবুর বাংলোয়। বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনা করতে। ধর্মপ্রাণ প্রফুল্লকুমার যে সাহিত্যপ্রাণ এটি আমার পক্ষে একটি নতুন অভিজ্ঞতা। তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে বছর পনেরো ষোল বাদে আমি লিখব 'পুতুল নিয়ে খেলা' আর তার উত্তরে তিনি লিখবেন 'বাঁদর নিয়ে খেলা'! আনন্দবাজারের পূজা সংখ্যায়। বাঁদরটি আমিই।

এর পরে একদিন কলকাতার রাজপথ থেকে প্রফুল্লবাবু আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যান ক্যালকাটা হোটেলের রবিবাসরে। আমার আশঙ্কা ছিল সমবেত সাহিত্যিকদের মাঝখানে আবার আমাকে নিয়ে বাঁদর খেলা না হয়। হওয়া বিচিত্র নয়। আমার পরণে তখন হাফ প্যান্ট। মাথায় সোলা হ্যাট। ছেড়েছি ধুতী ও চাদর। হাফ প্যান্ট আর সোলা হ্যাট পরে সেজেছি বিলিতী বাঁদর। কিন্তু সভায় যথেষ্ট খাতির পাই। প্রফুল্লবাবু আমাকে পাঠিয়ে দেন তাঁর লেখা খান তিনেক বই। সঙ্গে একখানি চিঠি। জানতে চান হিন্দুসমাজ কেমন করে বাঁচবে। এ যেন কালাপাহাড়ের কাছে জানতে চাওয়া, হিন্দুদের মূর্তি-গুলি কেমন করে রক্ষা পাবে। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলুম যে স্বরাজের পর আমরা সব আইন কানুন বদলে দেব। হিন্দুসমাজ বদলে গিয়ে বাঁচবেই। জানিনে তিনি তাতে আশ্বস্ত হলেন না সন্ত্রস্ত হলেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমার একটি অন্তর্জীবন ছিল। বারো বছর বয়সে আমার হাতে আসে 'সবুজপত্র'। 'চার ইয়ারী কথা' পড়তে পড়তে পাই আমার

পরবর্তী সাহিত্যিক জীবনের তিনটি বেসিক আইডিয়া বা ধ্রুবপদ : ইটারনাল ফেমিনিন। আর্ট। প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়। তখন থেকেই এই তিনটি দায় আমার উপর বর্তায়। যেন সরস্বতীর স্বপ্নাদেশ। ওদিকে ছন্দ ও মিলের কান তৈরি হচ্ছে রোজ সন্ধ্যাবেলা জয়দেবের গান ও বিদ্যাপতির পদ শুনতে শুনতে মায়ের কণ্ঠে ও বাবার মুখে। ওঁরা বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়েছেন। বাড়ীতে গোপাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৈষ্ণব কবিতা পাঠ করতে করতে আমি হয়ে উঠি লীলাবাদী ও সহজিয়া। রবীন্দ্রনাথকেও একদিন আবিষ্কার করি। তাঁর কাছে পাই মরমী দৃষ্টি বা মিস্টিক ভিসন। আমার নিজেরও একবার স্কুলজীবনে ও একবার কলেজ জীবনে মিস্টিক ভিসনের মতো কিছু মালুম হয়। স্কুল থেকে টলস্টয়ের 'তেইশটি উপকথা' পুরস্কার পেয়ে তার একটি বাংলায় তর্জমা করি। 'প্রবাসী' সেটি সাদরে পত্রস্থ করে। এমনি করে আমার সাহিত্যে প্রবেশ। অথচ তখনকার দিনে আমার অভিলাষ সাংবাদিক হওয়া। তার জন্যে একটা মূলমন্ত্র পেয়েছিলুম ঊনবিংশ শতাব্দীর আইরিশ নেতা জন কারানের উক্তি থেকে। ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অভ্ লিবার্টি। সেটা আমার মনে গেঁথে যায়। এইরকম সময়ে গান্ধীজীর রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাব। বেশ কিছুদিনের জন্যে আমিও ভেসে যাই।

পরে কাকার অনুরোধে কলেজে ভর্তি হই। সেখানে পাই বিরাট এক লাইব্রেরী। অধ্যয়নসূত্রে দেশের মনীষীদের সঙ্গ। প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বের বিগত ও জীবিত কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে পরিচয়। অন্তর্জীবন আরো সমৃদ্ধ হয়। বুঝতে পারি যে আমার প্রকৃত স্থান হচ্ছে সাহিত্যে। আর কিছুতে নয়। আর কিছু যদি অবলম্বন করি সেটা পেটের দায়ে, প্রাণের দায়ে। তার চেয়ে উচ্চতর দায় হচ্ছে রূপের দায়, রসের দায়, বাণীর দায়। আরো কয়েকটি বেসিক আইডিয়া বা ধ্রুবপদ লাভ করি। দান্তেকে পথ দেখিয়ে বিয়াট্রিস নিয়ে যাচ্ছেন ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বে। ঊর্ধ্বতম লোকে। যেখানে ভগবানের অধিষ্ঠান। আইরিশ কবি য়েটসের কবিতায় 'ইণ্টারনাল বিউটি ওয়াণ্ডারিং অন হার ওয়ে'। কীটসের কবিতায় 'বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি'। শেলীর কবিতায় 'দ্য ওয়ার্লডস গ্রেট এজ বিগিন্স অ্যানিউ'। সেইসঙ্গে উপনিষদের মন্ত্র, গীতার শ্লোক, যীশুর অনুশাসন।

এসব যেমন বাইরে থেকে ভিতরে আসে তেমনি ভিতরেও তো কিছু ছিল।

আগুন আর আলো আর রস। যা বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান তা সাহিত্যসৃষ্টিরও মূল উপাদান। আগুনকে আমি পারসীদের মতো জ্বালিয়ে রেখেছি, নিবতে দিইনি। আলো আমার নিত্য ধ্যান। রস আমার হৃদয় ভরে। তাই এখনো আমি সৃষ্টিশীল।

আমার কারাগমন ও বন্দীদশা

শিরোনামা পড়ে পাঠকরা চমকে উঠবেন। বলবেন, সে কী। আপনি আবার কবে জেলে গেলেন ও বন্দী হলেন?

এর উত্তরটা খুব মজার। আমি যতবার জেলে গেছি আর কোনো সাহিত্যিক ততবার জেলে যাননি। আমি যতকাল বন্দী থেকেছি আর কোনো সাহিত্যিক ততকাল বন্দী থাকেননি। এক জরাসন্ধ বাদে। তিনি তো জেলেই থাকতেন।

আমার প্রথম জেলযাত্রার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে এক বছর আগে। আর প্রথম বন্দীদশার অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হচ্ছে এই বছর। সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে হলে আর দেরি করা উচিত নয়। তাই স্মৃতিচারণ করছি।

আমাকে যখন রাজশাহী জেলার নওগাঁও মহকুমার সাব-ডিভিশনাল অফিসার করে পাঠানো হয় তখন আমার স্বপ্নেও জানা ছিল না যে আমাকে সেইসঙ্গে সাব-জেলেরও চার্জ নিতে হবে। সেখানে যাদের রাখা হতো তারা বিচারাধীন কয়েদী। বিচার শেষ হয়ে গেলে যাদের কারাদণ্ড হতো তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। যাদের কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড দায়রা জজ দিতেন তাদেরও প্রাথমিক বিচারের পর পাঠিয়ে দেওয়া হতো সদরের ওই জেলে। বলা বাহুল্য সেটা আমার এক্তিয়ারে নয়। আমার কাজ ছিল আমার মহকুমার ক্ষুদে জেলটির সাময়িক অধিবাসীদের তত্ত্ব তল্লাস করা। সপ্তাহে দু'দিন কি তিন দিন সেখানে আমার পদার্পণের কথা। কোর্টের কাছেই সাব জেল। যেতে আসতে কতটুকুই বা সময় লাগে! তবু সেটুকু সময় পাওয়াও দুষ্কর। বছরে অন্তত একশো দিন যাওয়া চাই। কিন্তু কার্যত ততদিন হয়ে উঠত না। মহকুমা হাকিমকে প্রায়ই শহরের বাইরে চরকির মতো ঘুরতে হতো। শহরে থাকলেও ঘন ঘন মীটিং করতে হতো। সুতরাং তিনি জেলে যাবেন কখন! দরকারও হতো না। বিচারাধীন কয়েদীর সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। তাদের সঙ্গে দেখা তো আদালতে হতোই।

নওগাঁও মহকুমায় আমি দেড় বছরের উপর ছিলুম। বিষ্ণুপুর মহকুমায় মাস ছয়েক। কুষ্টিয়া মহকুমায় দেড় বছরের উপর। তিন তিনটে সাব-জেল আমার

দেখা। সবসুদ্ধ ক'বার মহকুমা জেলে গেছি তা হিসাব করে দেখিনি। এখন হিসাব করে বলা শক্ত। স্মরণশক্তি দুর্বল।

এর পর আমি নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হই। সেখানকার সেণ্ট্রাল জেল পরিদর্শনও ছিল আমার কর্তব্য। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত আমি নই, জেলার সিভিল সার্জন। এর পর আমি মাস সাত আটের জন্যে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হই। সেখানকার সেণ্ট্রাল জেল পরিদর্শনও ছিল আমার কর্তব্য। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত আমি নই, সর্ব সময়ের জন্যে নিযুক্ত জেল সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট। মিস্টার লিউক ছিলেন সেই পদে। গুলী খেয়েও তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন। আমি তো তাঁকে তেমন দুর্ধর্ষ দেখিনি। দুর্ধর্ষ যদি বলতে হয় তবে অম্বিকা চক্রবর্তীকে। নির্জন সেলে হাতে পায়ে বেড়ী পরিয়ে রাখতে হয়েছিল তাঁকে। অপরাধ সেই চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। তার জন্যে রাজশাহীতে কেন ? বোধহয় সরকারের পলিসি ছিল 'বন্দী বন্দী ঠাঁই ঠাঁই'। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে জেল কর্মচারীরা ছিলেন। তাঁদের সাক্ষাতে অম্বিকাবাবুকে কীই বা বলতে পারি। মামুলী জিজ্ঞাসাবাদ। কেমন আছেন, কোনো অভিযোগ আছে কিনা। খাঁচায় বন্ধ শার্দুলকে দেখে মনে কষ্ট হয়। চোখে জল এসে যায়। গলা ভারী হয়ে আসে। এক ফাঁকে বলি, "আপনি একদিন মুক্ত হবেন।" সেদিনটি আসতে দশ বছর লেগে যায়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আরো কয়েকটি জেল পরিদর্শন করেছি। জেলা জজ হিসাবেও আরো কয়েকটি। মোট কথা জেলযাত্রা আমার জীবনে ঘটেছে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সতেরো বছর কাল। মাঝখানে ফাঁক গেছে একটি বছর। যে বছর আমি ছিলুম জুডিসিয়াল ট্রেনিংএ। বিচার করেছি, কিন্তু বিচারাধীন-দের দেখতে যাইনি। দেখবার অধিকারও ছিল না। বিচারাধীনদের দেখা এইজন্যে দরকার যে তাদের অনেককে অকারণে বা অযথা আটক করে রাখা হতো। এখনো হয়। আরো বেশী করে হয়। স্বাধীন ভারতের রেকর্ড পরাধীন ভারতের চেয়ে খারাপ। শাসনবিভাগ ও বিচার বিভাগ কেউ কারো সঙ্গে সহযোগিতা করে না বলেই শুনি। ফলে কয়েদীদেরই কষ্ট।

এখন বলি আমার বন্দীদশার কথা। এটা আরো কৌতুককর।

অন্য অন্য জেলায় কয়েকজন ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হবার পর তৎকালীন বাংলা সরকার স্থির করেন যে প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট-

দের জন্যে সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়োগ করা হবে। আমি তখন নওগাঁওর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। আমার উপরওয়ালা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পিনেল। তিনি আমাকে বলেন, "আমাদের কাজ হচ্ছে পাবলিকের সঙ্গে অবাধে মেশা। সশস্ত্র দেহরক্ষী দেখলে কেউ আমাদের সঙ্গে অবাধে মিশতে সাহস পাবে না। তা হলে আমরা লোকের অভাব অভিযোগ জানব কী করে, দূর করব কী করে? আমাদের কর্তব্য আমরা ঠিকমতো পালন করতে পারব না। আমি লিখেছিলুম সশস্ত্র দেহরক্ষী আমি চাইনে। এর উত্তরে সরকার থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, আমার জীবনের দায়দায়িত্ব আমার নিজের নয়, বাংলা সরকারের। আমার কিছু একটা ঘটলে ওঁদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং আমার নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট যা করবেন আমাকে তা মেনে নিতে হবে।"

অগত্যা আমাকেও। যদিও পুলিশ সাহেবের সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছিল না। একটা বারো বছরের ছেলে মুনসেফি আদালতের ছাদের উপরে উঠে জাতীয় পতাকা তুলেছিল। এই মহা অপরাধের জন্যে আমি তাকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিই। ইংরেজ পুলিশ সাহেবের ধারণা অমন করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে। একদিন দেখি আমাকে রক্ষা করার জন্যে সদর থেকে দুই মূর্তি উর্দীবিহীন কনেস্টেবল এসে হাজির। তাদের হাতে রিভলভার নয়, রাইফেল। তারা আমাকে না বলে আমার আউট হাউস দখল করে বসেছে। সেখানে ছিল আমার লেখার ঘর। দু'জনেই হিন্দুস্থানী। একজন মিশিরজী, একজন সিংজী। লোক দুটি বিশ্বস্ত ও নরম মেজাজের। কিন্তু আমার লোক নয়, পুলিশ সাহেবের লোক। যেন আমাকেই পাহারা দেবার জন্যে মোতায়েন হয়েছে। যেখানেই যাই রাইফেল নিয়ে ওদের একজনও যায় সঙ্গে। আমার সঙ্গে সে এক্কাতেও চড়ছে, হাতীর পিঠেও বসবে। পরে ওদের হাতে রিভলভার দেওয়া হয়। তখন ওদের পুলিশের লোক বলে চেনা যায় না।

নজরবন্দী হয়ে আমার সব চেয়ে বিপদ হলো নদীতে স্নান করা। আমার অভ্যাস ছিল নদীতে সাঁতার। সুইমিং কস্টিউম পরেই জলে নামতুম। নদীটা আমার বাংলোর সামনেই। সশস্ত্র দেহরক্ষী নদীর পাড়ে খাড়া। আমি সাঁতার কাটছি। সে এক দৃশ্য। একবার আমি বদলগাছী থানার ডাকবাংলোয় রাত কাটাই। পোয়া মাইল দূরে নদী। মাঝখানে মাঠ। ভোরবেলা উঠে নদীতে

যাই স্নান করতে। সুইমিং কস্টিউম নিয়ে যাইনি। পরনে ছিল স্লীপিং স্যুট। সেটা তো আর সাঁতারের উপযুক্ত নয়। খেয়াল হলো বিলেতের মতো দিগম্বর হয়ে জলে নামলে কেমন হয়। দেশটা বিলেত নয়। লোকে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। জায়গাটা জনশূন্য। চারদিকে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। এই তো মওকা। কিন্তু আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। পেছন ফিরে দেখি আমার দেহরক্ষী মিশিরজী। কী করে ওকে বোঝাব যে আমি একটু নিরিবিলিতে স্নান করতে চাই। আমাকে আক্রমণ করবার মতো সন্ত্রাসবাদীও ধারে কাছে নেই। ও কি একটু দূরে সরে যেতে পারে না! কিন্তু ওর উপরেও কড়া হুকুম। আমাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। যতক্ষণ না আমি ঘরে ঢুকি।

মিশিরজীকে কোন কৌশলে দূরে সরিয়ে রাখলুম মনে পড়ে না, কিন্তু জলে নেমে দেখি এক কোমর জল। জলে সর্বাঙ্গ ডোবালেও সর্বাঙ্গ ফুটে বেরোয়। ওদিকে মনে আতঙ্ক যে কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের মতো নদীর পাড় থেকে বস্ত্র হরণ করে তো গোপিনীদের মতো আমাকে জলে ডুবে থেকে কাকুতিমিনতি করতে হবে। সে যদি মিশিরজী হয় তো আমার লজ্জার সাক্ষী হবে। এমন সময় দূর থেকে দেখা গেল কে একটি মানুষ পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না, আমার ভাগ্য। সূর্য উঠছে দেখে আমিও উঠি। তাড়াতাড়ি গা মুছে নিয়ে স্লীপিং স্যুট গায়ে দিতেই লক্ষ্য করি মিশিরজী কী মনে করে মুচকি হাসছে। বিলেতে যেটা জলচল এদেশে সেটা অচল। সে এক্সপেরিমেণ্ট দ্বিতীয়বার করিনি।

বিষ্ণুপুরে আমার দেহরক্ষী হয় দু'জন পাঠান বা পাঞ্জাবী মুসলমান। ওরা আমাকে সমস্তক্ষণ চোখে চোখে রাখত। অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও বাধ্য। একদিন এক নার্স আমার বাংলোয় এসে নালিশ করে যে মুনসেফি আদালতের এক কেরানী তার বাসায় গিয়ে রোজ রাত্রে তাকে জ্বালাতন করে। লোকটি বিবাহিত। তা শুনে আমি তাকে তলব করি ও কৈফিয়ৎ চাই। সে একটা ফর্দ বার করে দেখায় ও বলে নার্সকে সে প্রায় একশো টাকার জিনিস জুগিয়েছে। দাম পায়নি। তা শুনে আমার পিত্ত জ্বলে যায়। গার্ডকে হুকুম দিই রিভলভার বাগিয়ে ধরতে। কিন্তু রিভলভারের হুমকিতেও লোকটা দমে না। বলে, "ওঁকে বলুন আমার পাওনা চুকিয়ে দিতে। নয়তো আমি আবার যাব।" তখন আমারও

রোখ চেপে গেছে। আর একটু হলেই বলতুম, "খোদাবক্স, ফায়ার।" সে বিনা প্রশ্নে ফায়ার করত। ওকে বলি রিভলভার নামিয়ে রাখতে। আমিই আমার হাতের ছড়ি দিয়ে বেয়াদবের পাছায় ঘা কতক কষিয়ে দিই। নার্সকে বলি বাড়ী যেতে। তাকে আর জ্বালাবার সাহস হবে না। কিন্তু আমাকেই পরে অভিযুক্ত হতে হয়।

মুনসেফ আমাকে চিঠি লিখে জানান যে লোকটির পাছায় রক্তাক্ত জখম। আমাকেই দায়ী করেছে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলি। তিনি জেলা জজের কাছে রিপোর্ট করেন। জজ সাহেব কেরানীকে দুর্গম জায়গায় বদলী করেন। নার্স রেহাই পায়। কিন্তু পরে জানা গেল মেয়েটারও দোষ ছিল। তার চাকরি যায়। বছর সাতেক পরে আমি হই বাঁকুড়ার জেলা জজ। কেরানীটি হয় আমারই কেরানী। আমার কাছে কান্নাকাটি করে বলে আমার জন্যেই ওর চরিত্রের সংশোধন হয়েছে, কিন্তু দু'জায়গায় দুটো এসটাব্লিশ-মেণ্ট রাখতে গিয়ে সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। আমি যদি ওকে দয়া করে বদলী করি। আমার মনেও অনুশোচনা জন্মেছিল। বিনা বিচারে বেত্রদণ্ড দেওয়া তো অন্যায়। যদিও তার বহু নজীর ছিল। ইচ্ছা করলে আমি প্রকাশ্য আদালতে ওর বিচার করে ওকে জেলে পাঠাতে পারতুম। তখন ওর চাকরিটিও যেত। যাক, ওকে দুর্গম জায়গা থেকে আবার বদলী করি।

কুষ্টিয়াতে আমার দেহরক্ষী ছিল না। ততদিনে সরকার স্থির করেছিলেন যে বাছা বাছা অফিসারদের দেহরক্ষী দেবেন। আমি তাদের একজন নই। আমিও বেঁচে যাই। কিন্তু কুষ্টিয়া থেকে যখন কৃষ্ণনগরে অস্থায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে প্রমোশন পাই তখন দেখি সেখানে আমাকে পাহারা দেবার জন্যে দুই দেহরক্ষী মোতায়েন রয়েছে। তারা রোজ রাত্রে তাদের রিভলভার আমার জিম্মা দিয়ে শুতে যেত। আর আমিও সে রিভলভার আমার সরকারী স্টীল আলমারিতে বন্ধ করে চাবী নিয়ে শুতে যেতুম। সেটা একটা গুরুতর দায়িত্ব। চাবী চুরি গেলে রিভলভারও চুরি যেত।

এর পরে ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ হিসাবে আমাকে আর সশস্ত্র দেহরক্ষী দেওয়া হয়নি ব্রিটিশ আমলে। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন আমাকে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক করে পাঠান তখন আবার সশস্ত্র দেহরক্ষীর প্রয়োজন হয়। সেখানে আমার কাজ ছিল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর চর পুনর্দখল করা।

ইতিমধ্যে দখল করেছিল পাকিস্তান। সে এক উত্তেজনাকব পরিবেশ। সেখান থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পর আমি বন্দীদশা থেকে মুক্ত। পদত্যাগ করার পর বরাবরের জন্যে মুক্ত।

রিভলভার বা রাইফেল যারই হাতে থাক না কেন সঙ্গী হিসাবে সেটা বিপজ্জনক। কত লোককে আমি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছি। কিন্তু নিজে কখনো নিইনি। কারণ আমার মনে দু'টি আশঙ্কা ছিল। একটি তো সন্ত্রাস বাদীদের দ্বারা চুরি হয়ে যাবার আশঙ্কা। অপরটি আমাব ছেলেদেব হাতে পড়াব আশঙ্কা। এই আশঙ্কাটা আমার মনে ঢুকিয়ে দেন বিখ্যাত ব্যাবিস্টাব অমিযনাথ চৌধুরী। ঢাকায় তিনি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা লড়তে গিয়ে প্রায়ই আমাব খাসকামরায় আসতেন, বাথরুম ব্যবহাব কবতে। একবাব এক ডিনাবে তিনি তাঁব ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলেছিলেন। তিনি যখন ঘুমিয়ে তখন তাঁব ছেলেরা তাঁর রিভলভার চুরি করে প্র্যাকটিস কবত। একদিন ঘুম ভেঙে দেখেন তাঁর দিকেই রিভলভার তাক করে গুলী কবার ভঙ্গী দেখানো হচ্ছে। ওদেব কাছে ওটা একটা খেলা। ওদেবই একজন পরে হন স্বাধীন ভারতেব প্রধান সেনাপতি জয়ন্তনাথ চৌধুরী।

দিলীপদা

দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আমার একটা অদৃশ্য অ্যাফিনিটি ছিল। যখনি কেউ জানতে চাইত সাহিত্যে আমার সবচেয়ে কাছের জন কারা আমি বলতুম, দিলীপকুমার রায় ও মণীন্দ্রলাল বসু। দিলীপদা ও মণিদা। আমার প্রথম জীবনে এঁদের ইউরোপ অভিসারী মন আমাকে ইউরোপের দিকে টেনেছে। একদিন ইউরোপে গিয়ে সত্যি সত্যি মিলিত হই মণিদার সঙ্গে। কিন্তু দিলীপদার সঙ্গে নয়। তার অনেক আগেই তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। আমি ইউরোপে বসে যা লিখি তিনি দেশে বসে তা পড়েন ও আমার দেশে ফেরার আগেই 'কালি-কলম' পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তার তারিফ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগও করেন যে আমি নাকি একদেশদর্শী।

দেশে ফিরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা ছিল। কিন্তু ততদিনে তিনি কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। আমি যে শুধু নিরাশ হই তা নয়, আমি মর্মাহত হই। আমি বুঝতেই পারিনে এমন কী ঘটল যার দরুন দিলীপকুমারকে সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরিবেশ থেকে বিদায় নিয়ে যোগসাধনায় নিমগ্ন হতে হলো। সেটা কি তাঁর পক্ষে পরধর্ম নয়? 'যৌবনে যোগিনী' বলে একটা কথা আছে। মেয়েদের জীবনে তেমন ঘটনার নজীর আছে। কিন্তু পুরুষরা কি জীবনের স্বাদ না নিয়েই যৌবনে যোগী হয়? শ্রীঅরবিন্দ তো যোগী হবার পূর্বে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন।

সন্ন্যাসের উপর আমার একটা বিজাতীয় বিরাগ ছিল। ওইখানেই আমার একদেশদর্শিতা। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস অবলম্বন আমি পছন্দ করিনি। আমার ধারণা তাঁর অকালমৃত্যুর সেইটেই কারণ। তখন আমার জানা ছিল না যে দিলীপদা বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসারী। সন্ন্যাসই তাঁর আবাল্যের আদর্শ। তাই যদি হয় তো এতবার প্রেমে পড়ার দরকারটা কী ছিল? গানের আসরে নারীবেষ্টিত হয়ে থাকা কেন? জনরব যা শুনি তার মর্ম দিলীপদা বিয়ে করতে ভয় পান বলে পলাতক। এদিকে যে কারো কারো হৃদয় ভেঙে চৌচির। ওদিকেও একজন ছিলেন, তিনিও পণ্ডিচেরীতে যৌবনে যোগিনী। দিলীপদার বন্ধুরা বলেন ওঁদের পক্ষে ও ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। পণ্ডিচেরীতে

ওঁদের সঙ্গীতসাধনার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে।

দিলীপকুমার দিলীপানন্দ হননি। সন্ন্যাসদীক্ষা নেননি। শ্রীঅরবিন্দ সন্ন্যাস-দীক্ষা নেননি, অরবিন্দানন্দ হননি। এটা একটা নতুন প্যাটার্ন। পণ্ডিচেরীতে নানা দিক দেশ থেকে সমাগত হয়েছেন যাঁরা তাঁরা দুই ভাগ হয়ে গিয়ে একটি নারীবর্জিত মঠ ও একটি পুরুষবর্জিত মঠ স্থাপন করেননি। তা যদি হতো তবে দিলীপদা সেখানে টিকতে পারতেন না। আদৌ যেতেন কি না সন্দেহ। তিনি যোগীই হোন আর ত্যাগীই হোন, তিনি জাতশিল্পী। জাতশিল্পীরা রূপ না হলে রস না হলে বাঁচতে পারেন না। দেশে যদি পণ্ডিচেরী না থাকত, শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনায় যদি নারীর স্থান না থাকত, পশ্চিমদেশ থেকে "মা" যদি না আসতেন, দিলীপদার উপর "মা" যদি স্নেহশীল না হতেন তা হলে দিলীপদা হয়তো জাতশিল্পীদের পীঠস্থান প্যারিস বা মিউনিকে পলাতক হতেন।

দেশে ফিরে আমি বাংলাদেশের মফঃস্বলে নিযুক্ত হই। লবণ সত্যাগ্রহ করে আমার এক বান্ধবী জেলে যান। পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে সুদূর ভেলোরে। সেইসূত্রে দিলীপদার সঙ্গে পত্রালাপ শুরু। তাঁকে লিখি যে আমার সেই বান্ধবী তাঁরও একজন ভক্ত ও আলাপী। তিনি যেন একটু খোঁজ খবর নেন। বান্ধবী কিছুদিন পরে ছাড়া পান। কিন্তু দিলীপদার সঙ্গে সেই যে পত্রসম্পর্ক স্থাপিত হয় তা সারাজীবন অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই বছরই আমি বিবাহ করি ও তাঁকে সেকথা জানাই। তিনি খুশি হন। এই বছর বন্ধুতার তথা বিবাহের পঞ্চাশপূর্তি ও সুবর্ণজয়ন্তী। অথচ এই বছরই দিলীপদা চলে গেলেন।

এ বেদনা ভোলবার নয়। পত্রালাপের কয়েকবছর পরে দিলীপদা আমাদের রাজশাহীর কুঠিতে অতিথি হয়েছিলেন। পুণাতেও আমরা দু'জনে বছর তেরো আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। সেখানে আমরা ছিলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি। পণ্ডিচেরীর পথ দিয়ে একবার আমরা জাহাজে করে সিংহলে যাই। কিন্তু জাহাজ থেকে নামিনে। আশ্রম দর্শন বা বন্ধুর সন্ধান ঘটে না। এ ছাড়া যতবার দেখা হয়েছে ততবার কলকাতাতেই। এইখানেই তিনি আমাকে একবার আলাপ করিয়ে দেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে। আরেকবার শ্রীআনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে। এঁদের সঙ্গে আমার কি কোনোদিন যোগাযোগ হতো, যদি না দিলীপদার সঙ্গী হতুম? এ দুটি অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়।

দিলীপদা বোধহয় চেয়েছিলেন আমার মনটাকে ধর্মের দিকে ফেরাতে।

সেদিক থেকে তিনি যত্নবান ছিলেন। তাঁর চিঠির সঙ্গে থাকতো শ্রীঅরবিন্দের চিঠির বা মন্তব্যের নকল। আশ্রমজননীর চিঠির বা মন্তব্যের নকল। আরো অনেকের চিঠির বা মন্তব্যের নকল। তাঁরাও পণ্ডিচেরী বা পুণার বা আলমোড়ার বা বিদেশের লোক। বহুভাষায় সুপণ্ডিত দিলীপদা লেখালেখিতে বিশ্বনাগরিক ছিলেন। গোড়াতেই হাত পাকিয়েছিলেন রাসেলকে ও রলাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমাকে প্রথমে আকৃষ্ট করে তাঁর 'মনের পরশ' ও তার পরে তাঁর 'তীর্থঙ্কর'। এ দুটি বই তাঁর প্রাক্‌পণ্ডিচেরী পর্বের জীবনদর্পণ তথা জীবনদর্শন। এর জের চলে পণ্ডিচেরী যাত্রার পরে প্রকাশিত তাঁর আরো কয়েকটি ইউরোপভিত্তিক উপন্যাসে। 'দু'ধারা' তো আমি রিভিউ করেছিলুম, কিন্তু সে লেখা যাঁদের দিয়েছিলুম তাঁদের পত্রিকা ভূমিষ্ঠই হয় না। লেখাও নিখোঁজ। ক্রমশ দিলীপদার উপন্যাসের বিষয় বদলে যায়। ইউরোপের পটভূমিকার জায়গায় আসে ভারতের পাহাড় পর্বত তীর্থক্ষেত্র আশ্রম। চরিত্রের মধ্যে থাকেন সাধুসন্ন্যাসী গুরুমহারাজ বা তপস্বিনী নারী। ভারতের জনজীবনে এঁরা কারো চেয়ে কম জীবন্ত নন। দিলীপদা এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তাঁর গৈরিকই তাঁর পাশপোর্ট। আর তাঁর গানই তাঁর ভিসা। এ সুযোগ তিনি ভিন্ন আর কোনো সাহিত্যিকের ছিল না।

অথচ তাঁর পণ্ডিচেরী পর্বের উপন্যাস আমাকে তেমন তৃপ্তি দিত না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কম হয় নি, কিন্তু তা নিয়ে ক'খানা উপন্যাস তাঁর হাত দিয়ে হয়েছে? ক'খানা নাটক? হয়েছে অজস্র সঙ্গীত। দিলীপদা রাশি রাশি গান রচনা করে যেতে পারতেন। তা না করে লিখেছেন উপন্যাস। রম্যন্যাস। নাটক ও কাব্য। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অত সহজে আর্টে পরিণত হবার নয়। আর্টের নিকষে উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর। দিলীপদা আমার কাছে প্রত্যাশা করেন অকুণ্ঠিত অনুমোদন। আমি তাঁকে নিরাশ করি। আর্ট নিয়ে বেধে যায় বিতর্ক। তিনি আর্ট ফর আর্টস সেক সইতে পারেন না। আমি ঠিক ওই তত্ত্বটিতে বিশ্বাস করি। এই মতান্তর ক্রমে মনান্তর হতে পারত, যদি না তাঁর গানের আমি অনুরক্ত ভক্ত হতুম। তা ছাড়া এমনিতেই তিনি ছিলেন স্নেহশীল আর আমিও তো স্নেহমুগ্ধ।

পণ্ডিচেরীর সঙ্গে দিলীপদা এমন নিবিড়ভাবে অভিন্ন হয়েছিলেন যে তাঁর পণ্ডিচেরীত্যাগ আমাকে চমকে দেয়। উনি কি তবে ওখানে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের

টানে? যোগসাধনার জন্যে নয়? শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক দেহত্যাগই কি ওঁর পণ্ডিচেরী আশ্রমত্যাগের হেতু? জিজ্ঞাসা করিনি। তিনিই একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানান। "আমি এবার ট্রাডিশনাল বৈষ্ণব সাধনায় ফিরে যাচ্ছি। জানো তো, আমি অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর। এ ধারা আমার রক্তের ভিতর বইছে।" আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা দিলীপদার জন্যে নয়। ওতে ওঁর ইনটেলেক্ট তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু ইমোশন তৃপ্ত হতে পারে না। ওঁর চরিত্রে ইমোশনের ভাগই বেশী। কিছুদিন পরে দেখা গেল ওঁর অঘটনঘটীয়সী প্রতিভা ওঁকে পুণায় নবনির্মিত হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা করেছে। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তো হরিকৃষ্ণ বলেন না। ওঁরা বলেন রাধাকৃষ্ণ। ওটা কি রাধাকৃষ্ণ মন্দির? ওখানে কি রাধারানীরও আরাধনা হয়। দিলীপদার চিঠিপত্রে কবিতায় উপন্যাসে রাধা অনুপস্থিত। উনি ভাগবতের অনুবাদ করে পাঠান। তাতেও রাধা অনুপস্থিত। এ তো গৌড়জনের ট্রাডিশনাল বৈষ্ণব সাধনা নয়।

সংশয় ভঞ্জন হয় পুণার হরিকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে। রাধারানীকেও প্রত্যক্ষ করি। দিলীপদা নিত্য ভজন কীর্তন গেয়ে শোনান। শ্রোতার সংখ্যা অগুনতি। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবী শিখ। যেখানেই দিলীপকুমার সেখানেই সঙ্গীত আর সেখানেই লোকারণ্য। দেবতার চেয়ে মানুষের সম্মোহনই বেশী। দিলীপদার নতুন পরিচয় 'দাদাজী'। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তাঁকে সেই নামে ডাকেন। তিনিও পণ্ডিচেরী প্রত্যাগতা। এঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকজন সাধক সাধিকা। স্থানটা বৃন্দাবন নয়, পুণা। এই যা তফাৎ। মহারাষ্ট্রের লোক তো কৃষ্ণকে বিঠ্ঠল ও তাঁর সঙ্গিনীকে রুক্মিণী বলে ভাবতে অভ্যস্ত। রাধাকে তারা পাত্তা দেবার পাত্র নয়। দিলীপদার এটা নবপ্রবর্তন বলে মনে হয়।

তা সত্ত্বেও আমি তাঁর রচনায় রাধাকে খুঁজে না পেয়ে আশ্চর্য হতুম। কিন্তু তার শেষ চিঠির সঙ্গে ছিল অন্য একজনকে লেখা অন্য একখানি চিঠির নকল। তাতে ছিল রাধারানীর স্বপ্নদর্শন। দ্বিজেন্দ্রলালের রাধাস্তব। দিলীপ-কুমারের রাধাবন্দনা। এমনি করে তাঁর প্রেমভক্তিরসের সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তবে জ্ঞানমার্গ তিনি কখনো পরিত্যাগ করেননি। আমাকে তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি মূল সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত পাঠ করছেন সম্প্রতি। "কী যে আনন্দ পাই ছত্রে ছত্রে!" ঋষিরা জ্ঞানেই তৃপ্ত হন। তিনি প্রাচীন

ভারতের ঋষিদেরও তো বংশধর।

পুণা পর্বই তাঁর জীবনের দীর্ঘতম তথা অন্তিম পর্ব। সাহিত্যের কাজ অবিরাম চলতে থাকে। আমার দিক থেকে উৎসাহ না দেখলে দিলীপদা আমাকে বইপত্র পাঠানো বন্ধ করে দেন। উৎসাহ দিই কী করে? স্পিরিচুয়াল আর অকাল্ট কি একই কথা? ভারতের অধিকাংশ সাধুর মতো দিলীপদাও অকাল্টকে স্পিরিচুয়াল মনে করেন এতে আমি প্রীত হতে পারিনে। স্পিরিচুয়ালে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু অকাল্ট সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। তবে এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। বই পাই, পড়ব বলে তুলে রাখি, সময় হয় না। আবো বই এসে হাজির। আবার তুলে রাখি। কোনো কোনোখানা বেহাতও হয়। তাই দিলীপদাকে জানানোও হয় না কেমন লাগল।

একদিন জোর করে পড়তে শুরু করে দিই 'পতিতা ও পতিতপাবন'। পরে আর জোর করতে হয় না। কাহিনী আপনিই টেনে নিয়ে যায়। বই যখন সারা হয় তখন আমি অভিভূত ও মুগ্ধ। জানতুম না যে ওটা সত্যঘটনা-মূলক। দিলীপদা বহুকাল পরে আমার মুখে তাঁর লেখার অকৃপণ প্রশংসা শুনে প্রীত হন। কিন্তু সেই চিঠিতেই লেখেন, "হ্যাঁ। দয়াল মহারাজের কাছে আমি ঋণী— পতিতার সন্তানকেও তিনি বুকে করে নিয়েছিলেন। বালক গাইতও চমৎকার, যদিও আজ সে লোকান্তরে। হাজার হাজার ভক্তকে আনন্দ দিয়ে। আহা, কী গানই গাইত এই দেবাবিষ্ট বালক!" বোঝা গেল যে বইখানি কল্পনাপ্রসূত নয়। এই চিঠিতে তিনি আরো লিখেছিলেন, "আমি তোমাকে কেন বই পাঠাই জানো? কারণ তোমাকে আর নিশিকান্তকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। আর কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকেই স্বপ্নে দেখি না, কেবল তোমাদের দুজনকে। এহেন তোমার প্রশস্তি দুষ্প্রাপ্য হয়ে আমাকে ঘা দিয়েছে।"

ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর পুণা থেকে লেখা সেই চিঠিতেই ছিল, "আমার দেহ দুঃখ দিচ্ছে খুবই। তবে মনে শান্তি অব্যাহত নিটোল আছে। হয়ত ডাক এসেছে, কে জানে। ডাক্তারে সাগরতীরে চেঞ্জে যেতে বলেছে। তাই যাচ্ছি ৩০-এ।" এর তিনদিন পরে আরেকখানি চিঠি লেখেন। সেটিই আমাকে লেখা তাঁর শেষ চিঠি। এটিও পুণা থেকেই লেখা। আমি তাঁকে যে চিঠি লিখি তার উত্তরে তাঁর কাছ থেকে আসে শুধু একটি রেকর্ড। তাঁর নয়, উমা বসুর। তাতে তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল। যে দিলীপদা একখানা চিঠি লিখতে

দু'তিনখানা লেখেন তার তিনমাস ধরে নীরবতা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। কন্যার আহ্বানে বম্বে যাচ্ছিলেন আমার স্ত্রী। তাঁকে বলি বম্বে পৌঁছেই যেন দিলীপদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিমান তাঁকে যথাসময়েই বম্বেতে পৌঁছে দেয়। তারিখটা ৬ই জানুয়ারি। বেলা আড়াইটের সময়ও ডাক্তারেরা বলেছিলেন, "খুব খারাপ নয়।" কার্ডিওগ্রাম নিয়ে দেখা গেল সব ঠিক। কিন্তু বেলা সাড়ে তিনটের সময় সব শেষ। দর্শনলাভ হলো না।

পুণা থেকে বম্বে যাত্রার প্রাক্কালে দিলীপদা "হরিকৃষ্ণমন্দির প্রাঙ্গণে" লিখে তার ভূমিকার প্রতিলিপি আমাকে পাঠিয়ে দেন। বোধ হয় আমাকেই উদ্দেশ করে লেখা ছিল তার উপরের পাতায়— "পড়বার সময় পাও তো পোড়ো। না পেলে না-ই পড়লে। এইটিই সম্ভবত আমার শেষ স্মৃতিচারণ— ছাপলে ৩০০ পৃষ্ঠার বই হবে মনে হয়। এ ছাড়া আরো কয়েকটি বই যন্ত্রস্থ। পরে পাঠাব। তুমি কী লিখছ আজকাল? জানিও যদি সময় পাও।"

ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "আমার নানা বইই বস্তুত স্মৃতিচারণ কি রমন্যাস, কি জীবনকাহিনী। আমার শুধু স্মৃতিচারণে নয়, নানা রমন্যাসেও স্মৃতিচারণার আনন্দ ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে।— এমন কি গানে গল্পে প্রবন্ধেও।"

এই বলে তিনি শুধু স্মৃতিকথা ও রমন্যাসের একটি তালিকা পেশ করেছেন। তালিকায় বাইশটি নাম। তার গোড়াতেই 'ভাবি এক হয় আর', যার নাম আগে ছিল 'মনের পরশ'। এসব কথা আমার জানা ছিল না। জানা থাকলে আমি উপন্যাসের কষ্টিপাথরে ফেলে বিচার করতুম না। উপন্যাস একটা আর্ট ফর্ম। যতই শিথিল হোক না কেন সেই ফর্ম। স্মৃতিচারণের তেমন কোনো ফর্ম নেই। বক্তার যতক্ষণ বলতে ভালো লাগে শ্রোতার যতক্ষণ শুনতে ভালো লাগে ততক্ষণ তার অবাধ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। উপন্যাসের সে স্বাধীনতা নেই। তার একটা অদৃশ্য সীমা আছে।

ভূমিকায় দিলীপদা বলেছেন, "অনেকের ভালো লেগেছে ভরসা পেয়ে লিখে গেছি নিরঙ্কুশ আনন্দে ঠাকুরকে সব বৃত্তি নিবেদন করে। দরদী পাঠকপাঠিকা খুশিই হয়েছেন, কিন্তু কুলীন সমালোচকদের মধ্যে অনেকে আমার আত্মবিজ্ঞপ্তির আমেজ পেয়ে যথাবিধি ভ্রূকুটি করেছেন, যদিও আমি লিখে গেছি সরল উল্লাসেই আমার বৃত্তিকে সাধ্যমত কর্মযোগ বলে বরণ করে গীতার এই আশ্বাসে (৩।১৯) যে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে বস্তুলাভ হবেই হবে।"

এখন তো দিলীপদা নেই, এখন তর্ক করব কার সঙ্গে ? তিনি নিজেই যখন স্বীকার করেছেন যে তাঁর 'দোলা' ভিন্ন তার সব উপন্যাস বা রমন্যাস তাঁর স্মৃতিচারণ তখন নিছক স্মৃতিচারণ হিসাবেই সেসব সাহিত্যকর্মের বিচার হবে। বিশ্বসাহিত্যে স্মৃতিচারণেরও স্থান অতি উচ্চে। তাতে আত্মবিজ্ঞপ্তির আমেজ থাকলেও তা অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। আপনাকে বাদ দিয়ে স্মৃতিচারণই হয় না। তাছাড়া দিলীপদার স্মৃতিচারণে আরো অনেকের কথা থাকে। তাঁরাও এক একটি চরিত্র। উপন্যাস বা রমন্যাস বলে গণ্য না হলেও তাঁর এসব বই খুবই চিত্তাকর্ষক।

দিলীপদা আমাকে অজস্র চিঠি লিখেছেন। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ চিঠিই আমি হারিয়ে ফেলেছি কিংবা এখনে সেখানে গুঁজে রেখেছি। উদ্ধার করবার সময় নেই। তিনি যে পত্রসাহিত্য রেখে গেছেন তা যদি কখনো সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয় তবে তারও আয়তন বিশ বাইশ ভলুম হবে। আশা করি তাঁর শিষ্যরা এ কাজটি হাতে নেবেন।

একাধারে গায়ক, সুরকার, কবি, ঔপন্যাসিক, স্মৃতিচারণিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার দিলীপকুমারের তুলনা দিলীপকুমার। এর উপরে আছে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার জীবন। তিনি যোগী, তিনি ভক্ত, তিনি ঈশ্বরের অন্বেষণে সর্বস্বত্যাগী। তাঁর কবিতায় একটা ভগবৎ ব্যাকুলতার সুর শোনা যায়। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুর বিগত চার বছর ধরে অহরহ শুনতে পান। আমি তো এতে অবিশ্বাসের কারণ দেখতে পাইনে। যে যা চায় সে তা পায়।

আমরা যারা তাঁকে ভালোবাসতুম তারা কেন ভালোবাসতুম তা বোঝাতে পারব না। আমার কাছে তিনি ছিলেন 'প্রিন্স চার্মিং'। প্রথম দিকে আমি চিঠিপত্রে কেবলি ঝগড়া করেছি কেন তিনি বিয়ে করলেন না। কেন তিনি পালিয়ে গেলেন। অর্থাৎ কেন তিনি আমাদের একজন হলেন না। পরে আমি মেনে নিয়েছি যে তিনি ঠিকই করেছেন। আমরা কেইবা তাঁর মতো সব্যসাচী, তাঁর মতো পরিশ্রমী, তাঁর মতো সর্বজনপ্রিয়। অপচয় বলে যেটাকে মনে হয়েছিল সেটা অপচয় নয়। তাঁর জীবন তিনি হিসাব করেই খরচ করেছেন. যদিও বাইরে থেকে দেখতে বেহিসাবী। শত শত ওস্তাদ বাঈজী সাধুসন্ত জ্ঞানী গুণীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কি আমাদের কারো কপালে জুটেছে ? আর কত বড়ো সৌভাগ্য শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা'র নিত্য সান্নিধ্য লাভ।

দিলীপদার সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে যায়। তিনি তার অন্তিম বমন্যাস আমাকেই উৎসর্গ করে গেছেন। ছিল একটা অদৃশ্য অ্যাফিনিটি দু'জনের মধ্যে। ভবভূতির কথায় আমরা সমানধর্মা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আর দেড় বছর বাদে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মশতবার্ষিকী। এখন থেকেই তার জন্যে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এই প্রস্তুতির একটি অঙ্গ হচ্ছে তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করা। ইতিমধ্যেই এ কাজে অগ্রণী হয়েছেন সুলেখক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিকল্পিত 'কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী' চার খণ্ডে প্রকাশ করার ভার দিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ সংস্থা বাকসাহিত্যকে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বাকী দুই খণ্ডের জন্যে আমরা কবির ভক্তরা ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করছি। কবির কোনো কোনো বই আলাদা আলাদা ভাবে কিনতে পাওয়া যায় শুনেছি, কিন্তু অধিকাংশ রচনা দুষ্প্রাপ্য।

বাল্যকালে বিভিন্ন পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথকে আমি আবিষ্কার করি। স্কুলের লাইব্রেরীতে ছিল তাঁর বেশ কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ। সেগুলিও আমি চেয়ে নিয়ে পড়তুম। অচিরেই তিনি আমার প্রিয় কবি হয়ে ওঠেন। সেটা শুধু তাঁর ছন্দসম্পদের জন্যে নয়। ভাবসম্পদের জন্যেও। অনুবাদে তো তিনি অদ্বিতীয়।

তাঁর সঙ্গে আমার এই পুঁথিগত পরিচয়ের ছ'সাত বছরের মধ্যেই তিনি গত হন। আমি স্তম্ভিত ও শোকাহত হই। 'প্রবাসী'তে তখন তাঁর 'ডঙ্কানিশান' চলছিল। অসমাপ্ত রয়ে যায়। গদ্যেও তিনি ছিলেন অসামান্য। এমন এক সব্যসাচী প্রতিভার অকালবিয়োগ দেশকে কাঁদায়। রবীন্দ্রনাথের রচিত বিলাপ-কবিতা কেবল তাঁর একার নয় আমাদের মতো সম্পূর্ণ অপরিচিত ও দূরবর্তী পাঠকেরও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় অন্তত একটি বিভাগে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেটি ছন্দবৈচিত্র্য। বাংলাদেশ কবিদের দেশ। কিন্তু যুগের পর যুগ তাঁরা কেবল পয়ার আর ত্রিপদী নিয়ে কাটিয়েছেন। মাইকেলের পর থেকেই অভিনবত্ব শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র ছন্দে লেখেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকেও ছাড়িয়ে যান। প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দকেও বাংলায় নিয়ে আসেন। বহু বিদেশী ছন্দকেও।

সত্যেন্দ্র প্রয়াণের দশ বছর যেতে না যেতেই দেখা গেল কবিরা আর ছন্দ

মিলের পরীক্ষা নিরীক্ষা'য় মন দেন না। কবিতা লিখতে গিয়ে পদ্যকেই বর্জন কবেন। স্বয়ং কবিগুরু এঁদের পুরোভাগে। বক্তব্যপ্রধান কবিতাকে পদ্যের বন্ধন মানতে বাধ্য করলে বক্তব্যের হানি হয়। চিত্রকল্পপ্রধান কবিতাকেও পদ্যের ছাঁচে ঢালা ক্ষতিকর। ফলে কান তেমন খুশি হয় না, চোখ কিংবা মন যেমন সুখী হয়। সত্যেন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে তিনি হতেন ব্যতিক্রম। তবে একমাত্র নয়।

ছেলেবেলায় তাঁর যে কবিতাটি আমাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল তার নাম 'সাম্য সাম'। এখনো মনে আছে, "এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি গলে?" এ জিজ্ঞাসা তখন থেকেই আমারও জিজ্ঞাসা। এ যুগেরও জিজ্ঞাসা। সত্যেন্দ্রনাথ দেশকে ভালোবাসতেন, সেইসঙ্গে যেযুগে জন্মেছিলেন সে যুগকে। বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম নায়ক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর পিতামহ। পিতামহের ধ্যান ধারণা পৌত্রের মধ্যেও বর্তেছিল। তাঁর কবিতায় যেমন দেশের স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত তেমনি ইতর ভদ্র শুচি অশুচি সকল মানুষের সাম্যের সাম গান মুখরিত। নর নারীর সাম্যেও তিনি বিশ্বাসী।

তিনি রবিমণ্ডলীর কবি। কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার লাভের পূর্বেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চাশৎপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্বর্ধনাসভায় পাঠ করেন 'কবিপ্রশস্তি' নামে যে সুদীর্ঘ কবিতা তাতে ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী—

'জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলে লইবে মানি,
হে কবি, তব প্রতিভা গুণে জগৎ কবি সর।'

কবিগুরু যখন নোবেল প্রাইজ পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করেন তখন তিনি আরো একটি স্মরণীয় কবিতা লিখে গুরুকে বরণ করেন। সেটি আমার হাতের কাছে নেই। বোধহয় তৃতীয় খণ্ডে গ্রথিত হবে। যতদূর মনে পড়ে এইরকম হবে—

'কীর্তিগগন সূর্য হে
পূজ্য হে

সে এক অপূর্ব ধ্বনিময় ছন্দ।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। এঁরা থাকতেন কবির সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে। কবি কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্যান্য সুহৃদরা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরে এরা পরিচিত হন 'ভারতী' গোষ্ঠী বলে। নবপর্যায়ের 'ভারতী'তে এদের সকলের লেখা আমি মুগ্ধ হয়ে পড়তুম। সে ছিল এক আশ্চর্য ভোজ। তাতে আমিও একদিন পাতা পেড়ে বসে যাই। প্রকাশিত হয় আমার 'পারিবারিক নারী-সমস্যা'। অমন কালাপাহাড়ী রচনা তখনকার দিনে আর কোনো পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহস পেতো না। 'ভারতী' ছিল বহুপরিমাণে সংস্কারমুক্ত। 'বঙ্গনারী' নামে সেকালে একজন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন। ওটি যার ছদ্মনাম, তিনি অমিয় চক্রবর্তীর জননী অনিন্দিতা দেবী। পুরীর সমুদ্রকূলে প্রতিদিন সান্ধ্যভ্রমণ করতেন। আমি তাঁকে চিনতুম। তিনি কিন্তু আমাকে চিনতেন না। কতই বা তখন আমার বয়স! আঠারো কি উনিশ। তিনি আমার প্রবন্ধের এক ঝাঁঝালো সমালোচনা লেখেন। যেন আমি কত বড়ো একজন দায়িত্বশীল লেখক। 'ভারতী' তার পরে বন্ধ হয়ে যায়। ততদিনে সত্যেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় হয়েছেন। তার পূর্বে সতীশচন্দ্র ও ও অজিতকুমার। অজিতকুমারেরও আমি ছিলুম এক পক্ষপাতী পাঠক। এঁদের কাউকেই আমি দেখিনি।

জয়দেবের পর ছন্দের দক্ষতা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার সন্তানদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথেরই সর্বাধিক। তাঁর এই কীর্তিই তাঁর অপরাপর কীর্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে। আবার এইজন্যেই তাঁর নাম পড়ে গেছে। লোকে আর ছন্দের কারু-কার্য চায় না। এটা শুধু এদেশেই নয়। ইংলণ্ডেরও মনোভাব একই রূপ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কবিতার ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয় ঘটে। ক্ষেত্র অধিকার করে বসেন এলিয়ট ও তাঁরই মতো কবিরা। গদ্যই কবিতার বাহন হয়ে ওঠে। সাধারণ গদ্য নয়, পর্বে পর্বে ভাগ করা গদ্য। তারও একপ্রকার ছন্দ। সভ্যতার অন্ত-সারশূন্যতায় নতুন কবিরা ক্ষুব্ধ। পুরাতন প্রত্যয়ের দুর্গ ধ্বসে গেছে। নতুন প্রত্যয় গড়ে তোলা সহজ নয়। এলিয়ট স্বয়ং মনে মনে বলছেন, খ্রীস্টং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি। তবে তাঁর সেই সংঘ রোমান ক্যাথলিক চার্চ নয়। তিনি হন অ্যাংলো-ক্যাথলিক। মহাযুদ্ধ-ছিল মোহমুদ্গর,

সভ্য মানুষের মোহভঙ্গ ঘটায়। এলিয়টের মতো যাঁরা মোহভঙ্গের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না তাঁরা ক্রমশই বামমার্গে গেলেন, কিংবা হলেন উন্মার্গগামী। এদেশেও তার প্রভাব পড়ে। অত্যাধুনিকরা এসে সত্যেন্দ্রনাথকে কোণঠাসা করেন।

গদ্যেও যে সত্যেন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল তার একটি চমৎকার প্রমাণ 'ছন্দ সরস্বতী'। বিভিন্ন ভাষার ছন্দ আয়ত্ত করে তার বাংলা প্রতিরূপ নির্মাণ করা কি সামান্য শক্তির পরিচায়ক? তাঁর ছন্দ পরিক্রমার কাহিনীকে সরস ভাষায় বর্ণনা করাও তেমনি শক্ত কাজ। শক্তকে তিনি সহজ করেছেন, তত্ত্বকে সুখ-পাঠ্য। এ রকম একটি রচনা একমাত্র তাঁর হাত দিয়েই সম্ভব। তিনি হাতে কলমে পরীক্ষা করে বুঝেছেন ও বুঝিয়েছেন কোন্ ছন্দের কী বিন্যাস। কোন্-খানে তার প্রাণ। পড়তে পড়তে কখনো মনে হয় না যে এসব ছন্দ প্রাণহীন ডাকের সাজ।

বিশ্বসাহিত্যের কাব্যনির্যাস যদি অল্প পরিসরের মধ্যে পেতে হয় তো 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থরেণু'তে। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে বিশ্বসচেতন তো ছিলেনই, আমাদেরও বিশ্বসচেতন করে গেছেন। ছেলেবেলায় আর কার কাছেই বা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার কবিতার রূপরস পেতুম! তিনি যেন সাত সমুদ্র মন্থন করে মণিমুক্তা তুলে এনে আমাদের উপহার দেন। বিদেশী উপন্যাসেরও অনুবাদ করেছিলেন তিনি। 'জন্মদুঃখী' মূলত একটি নরওয়ে দেশীয় উপন্যাস। বিদেশী নাটিকার অনুবাদও তিনি করেছিলেন। 'রঙ্গমল্লী'র চারটি নাটিকার একটি ইংরেজী, একটি ফরাসী, একটি চীনা, একটি জাপানী। সীতা, মাণ্ডবী, ঊর্মিলা, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতিকে নিয়ে লেখা হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'ধূপের ধোঁয়ায়' তাঁর মৌলিক রচনা।

গ্রন্থাবলী চার খণ্ডে সমাপ্ত হলে আরো অনেক চেনা জিনিসকে হাতের কাছে পাব। এতদিনে তাদের ভুলে গেছি। আগেকার দিনে সমস্ত যে পড়েছি তা নয়। যেখানে যখন যা পেয়েছি সব পড়েছি। সেও আজ পঞ্চান্ন বছর পূর্বে। সত্যেন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে আমার ধারণা বরাবর উচ্চ। ছেলেবেলায় পরীদের নিয়ে লেখা তাঁর একটি কি একগুচ্ছ কবিতা পড়েছিলুম। তাদের একজনের নাম জর্দা পরী'। বড়ো হয়ে ওড়িয়াতে লিখি 'পরীমহল' নামে একগুচ্ছ কবিতা।

কিন্তু সেসব পরী আমার নিজের কল্পিতা। একজন সমালোচক তার উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ করেছিলেন।

আমি প্রথম থেকে স্বীকার করে নিয়েছিলুম যে আমি তাঁর মতো ছন্দসিদ্ধ হতে পারব না। হতে গেলে হয়তো ধ্বনির খাতিরে সারবস্তুকে হারাব। তাই আমি তার কাছে শিক্ষানবিশী করিনি। আমার মনে হয়েছে তিনি এদেশের স্যুইনবার্ন। আমার আদর্শ শেলী, কীটস। তাঁদেব আমি পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের প্রথমযৌবনের কবিতায়।

উপেন্দ্রনাথ ও 'বিচিত্রা'

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল, তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে— এই দুজনের সঙ্গে আমার যে সাহিত্যিক-সান্নিধ্য এইটেই আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯১৮ কি ১৯ সালে আমি যখন স্কুলেব ছাত্র, তখস 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় একটি গল্পপ্রতিযোগিতা হয়েছিল, তাতে একটি গল্প ছিল, পুরস্কার পেয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে বলছি, কারণ এত কাল পরে, ষাট বছরের ওপর, ঠিক মনে থাকার কথা নয়। যতদূর মনে পডছে গল্পটির নাম ছিল 'অথ-মনর্থম্'। বিষয়টা ঠিক আমার মনে নেই। এইটুকু মনে আছে যে লেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটা খুব ভালো লেগেছিল। উপেনবাবুর গল্প যেমন হয়ে থাকে। খুব সরস গল্প, রসিয়ে বলা। একটু-আধটু বিষাদের ছোঁয়া থাকে হয়তো কোথাও, তা সেটা কিন্তু মনে রাখবার মতো কথা নয়। আরো অন্য গল্প পড়েছি, আরো অনেকের ভেতর লক্ষ্য করেছি। ইনি যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন তাও নয়, কে যে পেয়েছিলেন তাও মনে পড়ছে না।

বহুকাল পরে ১৯২৭ সালে যখন আমি বিলেত যাই, তার কিছু দিন আগে, আমার এক বন্ধু ভাগলপুরের কৃপানাথ মিশ্র, আমাকে একখানি চিঠি লেখেন। তাতে লেখেন যে, আমার প্রতিবেশী শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'বিচিত্রা বলে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। সেই মাসিক পত্রেই তোমার একটি রচনা প্রকাশ করবেন, তুমি যদি পাঠিয়ে দাও। ওঁকে তোমার কথা আমি বলেছি।

সে-সময় আমি ওঁকে একটি রচনা পাঠিয়ে দিই। সে রচনাটি 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়, বোধ হয় দ্বিতীয় সংখ্যায়, নামকরণটা সম্পাদকই করেছিলেন 'রক্তকরবীর তিন জন'। সেটা বেরিয়ে যাবার পরে, আমি বিলেত যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, হাতে আর সময় নেই, কিন্তু আবার একখানা চিঠি পেলুম, তাতে আমার সে বন্ধুটি লিখেছেন— উপেন্দ্রনাথের তোমার সে প্রবন্ধ পছন্দ হয়েছে। তোমার আরো কিছু লেখা তিনি চান।

তখন আমি লিখলুম— আমি তো বিলেত যাচ্ছি। তা বিলেত থেকে ওঁকে পাঠিয়ে দেবো ভ্রমণকাহিনী। উনি কি প্রকাশ করবেন?

বন্ধু পত্রপাঠ লিখলেন— হ্যাঁ, উনি রাজি আছেন।

আমি লিখলুম— ধারাবাহিক হবে। তিনি লিখলেন— হ্যাঁ, উনি তাতেও রাজি।

আমি যখন বিলেত যাই, জাহাজে ওঠার ঠিক আগের দিন বোম্বেতে বসে লেখা শুরু করি। একটা ইনস্টল্‌মেণ্ট তৈরি হয়ে যায়। সেটা দেশ ছাড়ার আগের রচনা। ঠিক বিলেতের কথা নয়। দেশের কথা দিয়েই আরম্ভ হয়। পরে সেটা পাঠিয়ে দিই এডেন থেকে। তার পর আবার পাঠিয়ে দিই বিলেত থেকে। এমনি করে ভ্রমণ কাহিনী আরম্ভ হয়ে যায়। দ্বিতীয় কিস্তিতে আসে বিলেতের কথা। পথের কথা, বিলেতের কথা— এই সব লেখা হয়। এইভাবে বছর দুই চলে। উপেন্দ্রনাথ খুবই খুশি হয়ে প্রকাশ করেন, তারিফও করেন। এটা আমার অপ্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি ও খ্যাতি পাই। রচনার নাম দিই 'পথে প্রবাসে'।

তার আগেও আমি লিখেছি কিছু-না-কিছু, তবে সেইটেই আমার আত্মপ্রকাশ বলতে পারা যায়, আমার প্রথম সাহিত্যকীর্তি বলতে পারা যায়। তার আগেও আমার লেখা বেরিয়েছে মাঝে-মাঝে। তার পর বিলেত থেকে যখন ফিরে আসি আমি তার আগে 'বিচিত্রা'য় কবিতাও মাঝে মাঝে পাঠাতুম, গল্পও পাঠিয়েছি। একবার একটা নাটক পাঠাই। নাটিকাও বলতে পারেন। উপেন্দ্রনাথ সেটা পেয়ে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় বিলেত থেকে আমার একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সেটা বন্ধ করে দেন। টেলিগ্রাম পাঠানোর কারণ হচ্ছে এই— আমি যাঁদের সঙ্গে ছিলুম তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর সরোজকুমার দাস। আমরা সবাই মিলে এক পরিবার। আমার সেই নাটকটা পড়ে ডক্টর সরোজকুমার দাস বললেন— ছাপিয়ো না, খবরদার। এ লেখা তুমি ছাপতে পারবে না। আমার যেন বদনাম না হয়!

আমি বললুম— কেন আপনার বদনাম হবে?

—কারণ সবাই চিনে ফেলবে আমাকে।

আমি বললুম— আপনার নামটাম কিচ্ছু তো নেই এতে। আমি প্রফেসার সরোজকুমার দাস লিখি নি। একজন ভেটেরিনারি সার্জনের নাম বলেছি।

—না, না, তা সত্ত্বেও চিনে ফেলবে। তুমি কক্‌খনো এটা ছাপতে পারবে না।

ওখানে একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল। ঐ দাস মশাইদের এক নার্স ছিল বাচ্চাকে দেখা-শোনা করার জন্যে। নার্স একদিন ঝগড়া করে চলে গেছে, চলে যাবার আগে বলেছে— আমি দেখে নেবো তোমাদের। দেখে নেবো, তোমরা আমায় ঠিকমত পেমেণ্ট করো নি।

—পাওনা নয় তবু দাবি করবে ? না, তোমার পাওনা নয়।

—আমি দেখে নেবো তোমাদের।

শাসিয়ে গেছে। তাতে তাঁরা ভয় পেয়ে গেছেন।

যে-ঘরটায় সে থাকতো, সেই ঘরটা কিন্তু কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। তাঁদের ধারণা যে, 'ওর ভেতরেই ও আছে। ওর বদমাইশি। ও আত্ম হত্যা-টত্যা একটা কিছু করেছে। আমার হয়তো জেল হয়ে যাবে, আমাকে এ রকম শাস্তি দিচ্ছে।' ভীষণ প্যানিকি। তিনি তখন তাঁর এক ইউরোপীয়ান বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন পুলিসকে ডাকতে। পুলিস কন্‌স্টেবলকে ডাকা হল। এক লম্বা-চওড়া পুলিস কন্সটেবল। সে পুলিস আবার আমার যে বেড রুম, তার ভেতর দিয়ে ঢুকে ব্যাল্‌কনি দিয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে ওদিককার জানালা খুলে ঘরে ঢুকলো। ঢুকে বলে— কেউ নেই। এদিকে ওদিকে কেউ নেই !

তার পর সবাই বোকা বনে গেলুম। এতবার চেষ্টা করা হল, বাইরে থেকে খুলছে না। ভেতর থেকে কেউ বন্ধ করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বন্ধ কেউ করে নি। মানুষ নেই, জনপ্রাণী নেই, তা হলে কোথায় গেল ? ভ্যানিশ করেছে না কি ? এইটে নিয়ে আমি একটা তামাশা লিখলুম। তা দাসমশায় বললেন— এতে আমার নিশ্চয় বদনাম হয়ে যাবে, লোকে ভাববে আমি ভীষণ ভীতু।

আমি ওটা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম 'বিচিত্রা'র জন্যে। সম্পাদক ছাপতেও দিলেন। ছাপা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাঁধতে দেওয়া বাকী ছিল। আমায় বললেন— তুমি এক্ষুণি যাও, টেলিগ্রাম করে দাও, টাকা দিচ্ছি তোমাকে। 'কেবল' করো, 'স্টপ ইট।' তা আমি সেই টেলিগ্রাম করে দিলুম।

দেশে যখন ফিরে আসি, উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বললেন —তুমি করেছো কী ? ছাপা হয়ে গিয়েছে, এতগুলো পৃষ্ঠা আমি দিয়েছি, দুফর্মা

না দেড় ফর্মা হয়েছে, এ জিনিসটা কী হবে ? বাঁধতে দেওয়া হবে না, ক্যানসেল করতে হল তোমার কথায়।

তখন আমি তো বললুম— এই হচ্ছে ব্যাপার।

তিনি হাসলেন খুব।— তা কথা যখন দিয়েছো, দাসমশায় বলেছেন, তখন বাজারে ছাড়া হবে না।' কিন্তু আমার জীবনে খুব দুঃখ রয়ে গেল যে, এটা মুদ্রিত অথচ 'প্রকাশিত' নয়। আবার সেটা হারিয়েও গেছে।

তখন সেই সময় উপেনবাবু বললেন— দেখ, তোমার 'পথে প্রবাসে' শেষ হয়ে গেল, আর একটা কিস্তি বোধ হয় বাকি আছে, তা তুমি এবারে একটা 'নভেলে' হাত দাও।

আমি বললুম— নভেলে হাত দেবো কী ? নভেল তো আমি কখনও লিখি নি ?

তিনি বললেন— যে ময়রা রসগোল্লা বানাতে পারে সে ময়রা সন্দেশও বানাতে পারে ; একই ভিয়ানে রসোগোল্লাও হয়, সন্দেশও হয়। কাজেই তুমি চাপিয়ে দাও, নভেল আরম্ভ করে দাও।

আমি বললুম— আমার তো সাহস হচ্ছে না।

তিনি বললেন— নভেল লেখার একটা 'সিক্রেট' তোমাকে বলে দিচ্ছি, সব সময় হাতে কিছু রাখবে। সমস্ত জিনিসটা খুলে দেখাবে না। একটু 'সাস্‌পেন্স ক্রিয়েট' করবে। কী হবে কী হবে ব্যাপারটা থাকবে। এটা যদি করো তা হলে দেখবে তোমার নভেল নিশ্চয় খুব 'সাক্‌সেস্‌ফুল' হবে। এবং কালে তা হলে তোমার লেখার যথেষ্ট সুখ্যাতি হবে।

আমি কখনো নভেল লিখি নি, লেখার কৌশল আমি জানি না। তা উনি জানেন, অনেকগুলো নভেল উনি লিখেছেন। তাই সফল ঔপন্যাসিক বলতে পারা যায়।

আমি ওঁর কথায় 'সত্যাসত্য' আরম্ভ করে দিলুম। তবে বহুদিনের একটা প্ল্যান ছিল, আমি যদি নভেল লিখি তো বড় আকারে লিখবো। আধুনিক জীবন সম্বন্ধে একটা জীবনদর্শনের বই হবে। এখন উপেনবাবুর আহ্বান— কী করবো, কী ভাবে লিখব ? একটা লেখার আগে দশবার ভাবতে হয়। এত বড় বই কোথায় ছাপাবো, কোথায় বেরোবে, কে নেবে— এ সব ভাবতে হয়! নির্ভয়ে আরম্ভ করে দিলুম। উনি বলে দিলেন— যত-খুশি লিখতে পারো,

আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই, আমি ছাপবো।

আমি বললুম— অনেকদিন লাগবে।

বললেন— তা লাগুক, আমার আপত্তি নেই।

এমন উদার সম্পাদক আমি দেখি নি। অন্যান্য সম্পাদকরা বলেন— এবার কলম থামাও, বড় বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। ওঁর তা নয়, একেবারে ঢালাও অনুমতি, তোমার যতদিন খুশি ততদিন লিখে যাও। যত বড খুশি তত বড করবে।

আমি বললুম— বই কিন্তু একখণ্ডে সমাপ্ত হবে না! অনেকগুলো খণ্ড হবে।

উনি বললেন— তা হোক।

আমি মাসে মাসে লিখতে আরম্ভ কবি। তার পরে সরকারী চাকরিতে এমন জড়িয়ে পড়ি যে, মাসে মাসে আর লেখা সম্ভব হয় না। মাঝে মাঝে 'গ্যাপ' পড়ে যায়। ঐ করতে করতে একদিন বন্ধই হয়ে গেল। 'সিরিয়াল পাবলিকেশন' বন্ধ হল। তার পবে আবার খণ্ডে খণ্ডে বের করেছি বই হিসেবে। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কেরও ছেদ পডে গেল। শেষ দিকে দেখা গেল 'বিচিত্রা' আর ভালো চলছে না। একবার গিয়েছিলুম দেখা কবতে, বললেন— দেখো অনেক খরচ-পত্তর করে আবম্ভ করেছিলুম, ঠিক মতো কাটতি হচ্ছে না, অনেক লোকসান হয়ে গেছে। যাই হোক আমি চালিয়েই যাব। তার নতুন বন্দোবস্ত করছি, তোমরা যেমন লিখছো লেখো। যে খরচটা হয়েছে সেটা ঠিকই আস্তে আস্তে উঠে আসবে। তা সতিাই উঠে এলো। সুবোধ মিত্তির মহাশয় ওঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

এ আমাদের সকলের পক্ষে একটা খুব দুঃখের ঘটনা যে 'বিচিত্রা' উঠে গেল। 'বিচিত্রা' আসলে উপেনবাবুর মুখপত্র যত-না ছিল ততটা আমাদের মুখপত্র ছিল। যদিও অন্য পত্রিকায়ও লিখতুম কিছু কিছু তবু এটার ওপরই আমার নিজের একটা দাবি ছিল যে এ আমার নিজের কাগজ। এবং ওঁরও আমার ওপর দাবি ছিল যে আমি ওঁর নিজের লেখক।

'বিচিত্রা' বন্ধ হয়ে যাবার পরে উপেনবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক খুব ক্ষীণ হয়ে যায়। আমিও কলকাতায় কদাচিৎ আসি, ওঁর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয়। পরে একদিন উনি আমাকে জানালেন, সে অনেকদিন বাদে যে, "আমাকে 'গল্প-ভারতী'র ভার

দেওয়া হয়েছে। আমি আবার পরম উৎসাহে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। তোমাকে আমার চাই। আমরা যেমন এককালে সব ছিলুম 'বিচিত্রা'র গ্রুপ তেমনি আবার 'গল্প-ভারতী'র গ্রুপ হবো। তুমি আমাকে লেখা পাঠাবে প্রত্যেক মাসে, আমি প্রকাশ করবো।"

আমি দেখলুম যে, ওঁর প্রাণে একটা নতুন জোয়ার এসেছে, আমি ওঁকে বিমুখ করতে পারি না। 'সুখ' নামে আমার লেখা ছোট্ট একটা উপন্যাস দিলুম ওঁকে প্রকাশ করবার জন্যে, সেটা ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। তার পরে উনি আরো চেয়েছিলেন, আর পারি নি, নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলুম বিভিন্ন লেখায়।

এই সব করতে করতে তাঁর জীবনের শেষের দিকে, একদিন মনে আছে, দেখা করতে গিয়েছিলুম। তিনি বললেন— দেখ, আমার চিকিৎসক এসেছে দেখে যেতে, আসানসোলে যাচ্ছি, যেতে ইচ্ছে করছে না, অঞ্জনা দেবী আমাকে ছাড়তে চান না।

আমি বললুম— তার মানে ?

—আমার এ্যান্‌জাইনা আছে, সেই এ্যান্‌জাইনা নিয়েই যাচ্ছি।

এন্‌জাইনা কী জিনিস তা তো জানতুম না। তার বছর কয়েক পরে অঞ্জনা দেবীর ভর হলো আমার ওপরেও। তখন বুঝতে পারা গেল যে দেবীর দয়া কী, রকম।

তাঁর সেই বয়সে, বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি, কি আশিই হয়ে গেছে হয়-তো, অঞ্জনা দেবী বাস করছেন তাঁর সঙ্গে। দেখলুম পরম উৎসাহে চললেন আসানসোলে সাহিত্য সম্মেলন করতে।

যখন যে ডাকতো যে কাজে, সে কাজে সাড়া দিতেন। 'না' বলতেন না। আর অত্যন্ত সুমিষ্ট ব্যবহার, সুমিষ্ট কথাবার্তা। নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি বলতেন না, আমাদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন।

তবে তাঁর শেষ জন্মদিনে আমি তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে। তার কিছু দিন বাদেই তিনি মারা যান।

সেই জন্মদিনের পরেই মৃত্যুদিন এত শীঘ্র এলো !

খুব আক্ষেপ হলো। কলকাতায় গিয়ে দেখা করলেই হতো।

ভালোবাসতেন খুব। গেলে খুশি হতেন খুব। আর স্মরণ করিয়ে দিতেন

সে সব পুরনো কথা।

পরে দেখি তাঁর আত্মজীবনীতে আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ আর লেখা সম্বন্ধে লিখেছেন অনেক। তা আমি বললুম যে, এতে একটা ভুল আছে। আপনি যদি একটু সংশোধন করে দেন তো খুব ভালো হয়। উনি কিন্তু কবুল করতে চাইলেন না।

লিখেছিলেন যে ওঁর সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেন নির্মলা দেবী। ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

আমি বললুম যে, না, নির্মলা দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ট্রেনে, বিলেত যাব বলে যাচ্ছি আমি কটক থেকে। সে সময় বন্যা হয়েছিল। ট্রেনটা সোজা কলকাতায় এলো না। নির্মলা দেবীর সঙ্গে আমি গেলুম কটক থেকে এক কম্পার্ট-মেণ্টে বেজওয়াডা পর্যন্ত, তার পরে উনি অন্য কম্পার্টমেণ্টে উঠলেন ও হায়দ্রাবাদে ট্রেন বদল করে কলকাতা অভিমুখে চললেন, আমি বম্বে অভিমুখে। আমার এক বন্ধু, ওঁর দেওর কটকে আমায় বললেন যে— ইনি আমার বৌদি, তুমিও যাচ্ছ, তুমি একটু ওঁকে দেখাশোনা করবে।

আমি দেখাশোনা কী করবো, উনিই দেখাশোনা আমায় করলেন। কারণ আমার তখন দারুণ ডায়রিয়া। আমি ঘোল খেয়ে যাচ্ছি। ঘোলের বোতল নিয়ে গেছি একটা। আমি যে একজন সাহিত্যিক বা সাহিত্য লিখছি বা লিখেছি, এ সব কোনো কথাই উনি জানতেন না বা আমিও বলি নি। আমার সাহিত্যিক পরিচয় ছিল না তখন। উপেনবাবুর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক সেটাও তিনি জানতেন না। যদিও ইতিমধ্যে 'রক্তকরবীর তিনজন' বেরিয়ে গিয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে আমি যেদিন উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাই বিলেত থেকে ফিরেই, সেদিন নির্মলা দেবী উপেন্দ্রনাথের বাড়িতে 'গেস্ট' ছিলেন। সেদিন আবার দেখা হল ওঁর সঙ্গে।

উপেন্দ্রনাথ বরাবরই চিঠিপত্র লিখতেন। আমিও মাঝে মাঝে লিখতুম। কাজেই সাহিত্যিক যে যোগাযোগ সেটা 'বিচিত্রা'র জন্যে হয়েছিল, পরে 'গল্প-ভারতী'র জন্যে।

আমার জীবনে বাস্তবিক একটা আনন্দ হচ্ছে— ওঁর আশীর্বাদ। সেদিন উনি চেয়েছিলেন, আর তো কেউ চায় নি— কেউ চায় নি, আমিও গায়ে পড়ে কাউকে পাঠাতুম না। লিখতুম কিনা সন্দেহ, লিখলেও পাঠাতুম কি-না সন্দেহ।

কে আর দুবছর ধরে ছাপতো। আর ও ধরনের লেখা রামানন্দবাবুও পছন্দ করতেন না। যতটা লিখেছি আমি স্বাধীনভাবে বিলেত সম্বন্ধে রামানন্দবাবু তা পছন্দ করতেন না।

যাক, ওটা একটা কথা। আর দ্বিতীয় কথা হল— 'নভেল'। উপন্যাস লেখা ওঁর জন্যেই হল। উনি যদি প্রশ্রয় না দিতেন, যদি উপন্যাসেব কৌশল না শেখাতেন, তা হলে আমার উপন্যাস লেখা বোধ হয় আর হতো না। কারণ আমি তো জানতুম না কায়দাটা কী? আমার সাহিত্যগুরুদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। তেমনি আরেকজন হলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। আর সকলের গুরু যেমন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি আমারও। এই তিন-জনকে বাংলা সাহিত্যে আমাব গুরু বলে মনে করি— রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ।

এই তিনজনের মধ্যে একজনের স্নেহই বিশেষভাবে পেয়েছি, কারণ ওঁব স্নেহেব অনেকটা ঠিক অসাহিত্যিক স্নেহ, বাকিটা সাহিত্যিক স্নেহ। ওঁর সঙ্গে সাহিত্যের বাইরে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। যেন একটা পিতৃস্নেহ। আমি সাহিত্যিক হলেও পেতুম, না-হলেও পেতুম।

প্রেমচন্দ্

পিতৃদত্ত নাম ধনপত রায়। বংশ পদবী মুন্‌শী। উত্তরভারতের রীতি অনুসারে লিখতে হয় মুন্‌শী ধনপত রায়। সরকারী চাকরি করতে করতে গল্পের বই লেখেন উর্দূ ভাষায়। তখনকার দিনে যুক্ত প্রদেশের আদালতের ভাষা ছিল উর্দূ। সরকারী ভাষা ইংরেজী। হিন্দী ভাষায় লিখলে পাঠক মিলত না। আর নিজের নামে লিখলে সরকার পছন্দ করতেন না। তাই ছদ্মনাম নিতে হলো 'নওয়াব রায়'। সরকারের সমালোচনা ছিল, সরকার টের পেয়ে সব কটি কপি বাজেয়াপ্ত করলেন। তখন ছদ্মনাম পালটাতে হলো। 'নওয়াব রায়' থেকে 'প্রেমচন্দ্'। এর পরের ধাপ উর্দূ থেকে হিন্দী। ইতিমধ্যে হিন্দীর আদর বেড়েছে। মুন্‌শী প্রেমচন্দের গল্প উপন্যাস চারদিকে সাড়া তোলে। এর পরে তিনি অসহযোগের হাওয়ায় ভেসে গিয়ে সরকারী চাকরি ছেড়ে দেন। তখন থেকে সাহিত্যই হয় জীবিকা। শেষের দিকে ছাপখানা চালাতে গিয়ে নাজেহাল হন। ছাপান্ন বছর বয়সে দেহত্যাগ করলেও সেই বয়সে তিনি হিন্দী কথাসাহিত্যের কুলপতি। ভারতের দিকে দিকে ছদ্মনামধন্য।

পাটনা কলেজে আমার এক বিহারী সহপাঠী ১৯২৩ সালে আমাকে বলেন যে বাংলায় যেমন শরৎচন্দ্র হিন্দীতে তেমনি প্রেমচন্দ্। স্বয়ং শরৎচন্দ্র নাকি তাঁর সুখ্যাতি করেছেন। আমি কৌতূহল বোধ করি। হিন্দী যদিও জানতুম না দেবনাগরী তো জানা ছিল। হিন্দীভাষী একটি সংস্থা কী এক উপলক্ষে আমাকে পনেরো কি বিশ টাকার একটি পুরস্কার দিতে চাইলে আমি টাকা নিইনে, তার বদলে নিই প্রেমচন্দের 'প্রেমাশ্রম'। মোটা খাদি দিয়ে বাঁধানো সেই মোটাসোটা বই কোনো মতে কিছুদূর পড়ে তখনকার মতো তুলে রাখি। পরে আর সময় হয়নি। প্রেম-যুক্ত টাইটেলের তাঁর আরো একখানি উপন্যাস ছিল, যতদূর মনে পড়ে। তখন কিন্তু কেউ আমাকে বলেনি যে প্রেমচন্দ্ তাঁর ছদ্মনাম। ভাবতুম তিনি কেবল নিজে প্রেমনামা নন, তাঁর গ্রন্থগুলিও প্রেমনামা। আর কাউকে তো অতটা প্রেমমুগ্ধ হতে দেখা যায় না! বহুকাল পরে যখন জানা গেল যে ওটা তাঁর ছদ্মনাম তখন বোঝা গেল তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্রেম। সেই কেন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর লেখকসত্তা ও তাঁর লিখিত বস্তু।

প্রশান্ত গ্রামের দীনহীনদের নিয়েই তাঁর সাহিত্যিক সংসার। ওই সব মূক মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিলাইদহে লেখা গল্প গুলিতেও সেকাজ আরো আগে করতে চেয়েছিলেন। প্রেমচন্দ ছিলেন তাদের আরো কাছাকাছি। নিজেও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। দরদ তাঁর পক্ষে সহজাত। তাঁদের কথা বলবার জন্যেই তিনি সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন, তাঁদের কথা বলতে বলতেই বিদায় নেন। কিন্তু কেবল তাঁদের কথাই নয়। মধ্যবিত্ত সমাজেও তাঁর গতিবিধি ছিল। তারাই তো তাঁর প্রকাশক ও পাঠক। অবস্থার উন্নতি হলে নিম্ন মধ্যবিত্তও মধ্যবিত্তে পরিণত হয়। শহরে গিয়ে বাস করে। নিজেই তার দৃষ্টান্ত।

জাতীয়তাবাদী ও সমাজসংস্কারক রূপেই তাঁর প্রকাশ। গান্ধীবাদী বা গান্ধীপন্থী রূপেই তার বিকাশ। কিন্তু শেষের দিকে তিনি হয়ে ওঠেন সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী। তখনকার দিনের বামপন্থী। তা বলে বিপ্লবী নন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দশা হয়েছে কবীরের মতো। উভয় সম্প্রদায়ই আপনার বলে দাবী করছে। যেমন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদীরা তেমনি কমিউনিস্ট দলের প্রগতিবাদীরা।

পাটনা থেকে চলে আসার পর হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সেটা পুনঃস্থাপিত হয় ১৯৩৫ সালে। 'হংস' মাসিকপত্রের মাধ্যমে। যার যুগল সম্পাদক মুন্‌শী প্রেমচন্দ আর কনহাইয়ালাল মুন্‌শী। ইনিও মুন্‌শী, উনিও মুন্‌শী। একজনের মুন্‌শিয়ানা হিন্দী সাহিত্যে, অপরজনের মুন্‌শিয়ানা গুজরাটী সাহিত্যে। ভারতের দুই সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল পূর্বে বা পরে কখনো এক-বৃন্তের ফুল হননি। ইতিহাসে সেই প্রথম ও সেই শেষ। মাসিক পত্রটি হিন্দী ভাষায় পরিচালিত হলেও তার বিষয়বস্তু সর্বভারতীয়। অন্যান্য ভাষার গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা হিন্দীতে অনূদিত হয়ে একত্র গ্রথিত হতো। ভারতের কোন ভাষায় কে কী লিখছেন জানার ওছাড়া আর কোনো সূত্র ছিল না। পড়তে পড়তে আমার হিন্দীর জ্ঞান ঝালিয়ে নিই। আর ভারতের অন্যান্য সাহিত্যের সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হই। ওটা পরে আমার কাজে লাগে। বম্বে, বড়োদা, পুণা বেড়াতে গিয়ে তাঁদের কয়েকজনকে দেখতে পাই। আমি যে তাঁদের লেখা পড়েছি একথা শুনে তাঁরা বিস্মিত হন। কনহাইয়ালাল মুন্‌শী ততদিনে কংগ্রেসমন্ত্রী হয়েছেন। দেখা হয়, কথাবার্তা হয় না। তাঁর বাড়ী

গিয়ে তাঁর পত্নীর সঙ্গে আলাপ করে আসি। লীলাবতী মুন্‌শীও সুলেখিকা। কন্‌হাইয়ালালও প্রেমচন্দের মতো সমাজসংস্কারক ছিলেন। বিধবাবিবাহ করে-ছিলেন। প্রেমচন্দ্‌ ও কন্‌হাইয়ালাল মুনশী 'হংস' সম্পাদনা করে ভারতের অশেষ উপকার করতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেমচন্দ্‌ বছর খানিক পরে ইহ-লোক ত্যাগ করেন।

তখন আমি সেকথা জানতুম না। 'হংস' কেন আর আসে না ভেবে বিস্মিত হই। মাসিকপত্রটি যে প্রেমচন্দের সঙ্গে সহমরণে গেছে এটা পরে উপলব্ধি করি। কেন? কন্‌হাইয়ালাল কি এক হাতে ওটা চালাতে পারতেন না? তিনি তো বম্বের বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট। কিন্তু ওঁর তখন রাজনীতির উপরেই দৃষ্টি। সামনে সাধারণ নির্বাচন। যতদূর মনে পড়ে প্রেমচন্দ্‌পত্নী শিবরানী দেবী ও তাঁর পুত্র-দ্বয় শ্রীপৎ রায় ও অমৃত রায় 'হংস'কে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কাজটা অতি দুরূহ। টাকার জোগাড় হলেও লেখার জোগাড় হয় না। হাল ধরবার মতো যোগ্য মাঝি চাই। হাঁস তো নীর ছেড়ে ক্ষীর খায় শুনেছি। মূল রচনার ভালো মন্দ বাছাই করবে কে? একরাশ অনুবাদই তো যথেষ্ট নয়।

প্রেমচন্দের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবার কেটে যায়। হিন্দীর সঙ্গেও। তাঁর লেখার বাংলা অনুবাদ এখানে ওখানে দেখেছি। সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম 'সতরঞ্জ কে খিলাড়ী' আর 'সদ্‌গতি' আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবে তার মধ্যে কতটুকু প্রেমচন্দ্‌ আর কতখানি সত্যজিৎ তা বলতে পারব না। সময় পেলে 'গোদান' পড়ব। প্রিয়রঞ্জন সেন অনুবাদ করে গেছেন বাংলায়। হাতের কাছে খান দুই ইংরেজী অনুবাদও রয়েছে। একটা একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের।

প্রেমচন্দ্‌ ছিলেন একটি যুগের প্রতিনিধি। সে যুগ আর নেই। এখনকার মানুষ তখনকার মানুষদের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করতে পারবে কি না সন্দেহ। কেবলমাত্র গরিব দুঃখী হওয়াই তো যথেষ্ট নয়। প্রবলের অত্যাচারও এখন অন্য আকার পেয়েছে। জমিদার, তালুকদার নয়, জোতদার। ব্রাহ্মণ নয়, রাজপুত বা যাদব। প্রেমচন্দ্‌ নিজেও কালজয়ী হতে চাননি। অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে-ছিলেন। তাঁর লেখনীই তাঁর হাতিয়ার। সেদিক থেকে তিনি বহুপরিমাণে সার্থক হয়েছেন। হিন্দী সাহিত্যের সৌরজগতে এখনো তিনি সূর্য। যতদূর জানি এখনো তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর দান চিরস্মরণীয়।

রাজশেখর শতবর্ষে

অমন সার্থক জুটি সচরাচর দেখা যায় না। 'পরশুরাম' রচিত ও 'নারদ' বিচিত্রিত একটির পর একটি গল্প যেন একটির পর একটি চমক। এঁরা দু'জনে অচিরেই আমার ও আমার কলেজ জীবনের বন্ধুদের হৃদয় জয় করে নেন। আমরা পরশুরামের গল্পের জন্যে মাসের পর মাস অধীর আগ্রহে মাসিকপত্রের পথ চেয়ে থাকি। মাসিকপত্র এলে আমরা কাড়াকাড়ি করে পড়ি।

যতদূর মনে পড়ে, 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'ই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। তার পরেই বোধ হয়, 'কচিসংসদ'। প্রথমটিকে নিয়ে যারা হৈচৈ করেনি তারা দ্বিতীয়টি নিয়ে কলেজ তোলপাড় করে। পরস্পরকে বলে, 'তুমি পেলব রায়', 'তুমি শিহরণ সেন', 'তুমি অকিঞ্চিৎকর', কিন্তু সব চেয়ে পরিহাসের পাত্র হয় যার নাম 'লালিমা পাল (পুং)।' কেউ ও নাম স্বীকার করতে রাজী নয়। কৌতুকের কথা, লালিমা শব্দটি এমনিতেই স্ত্রীলিঙ্গ নয়। যেমন নীলিমা নয় স্ত্রী-লিঙ্গ। না, সবিতাও স্ত্রীলিঙ্গ নয়। তখন কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল যে লালিমা হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ। তাই তার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে হয় পুরুষ পরিচয়।

অভিনয়ের পক্ষে আরো উপাদেয় ছিল 'চিকিৎসা সঙ্কট'। মনে পড়ছে না ওটার অভিনয় তখনি শুরু হয়ে যায় কি-না। বছর কয়েক পরে যখন বিলেত যাই তখন সেখানে আমার বন্ধুরা 'বিরিঞ্চি বাবা' অভিনয় করেন। পরশুরামের অনেক গল্প নাটকে রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তীকালে অভিনীত হয়েছে। সকলেরই ভালো লেগেছে।

কে এই পরশুরাম? ক্রমে ক্রমে জানা গেল তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার রাজশেখর বসু। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও কর্মবীর। নারদও তাঁর সহ-কর্মী যতীন্দ্রকুমার সেন। এঁদের বন্ধুতা চিরস্থায়ী হয়েছিল। একজন লিখতেন, আরেকজন লেখকের মন জেনে আঁকতেন। ওসব গল্পের অর্ধেক মজাই ছিল ওই-সব ছবি। নয়তো রস অর্ধেক জমত না। রাজশেখরকে স্মরণ করবার সময় যতীন্দ্রকুমারকেও স্মরণ করতে হয়। 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' যাঁরা ভালো-বাসেন তাঁরা তার অপূর্ব ছবিগুলিকে ভালোবাসেন। একথা খাটে পরশুরামের 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের বেলাও।

এই পর্যায়ের গল্পগুলির অন্তরালে একজন সমাজ সমালোচকের কটাক্ষও ছিল। কিন্তু হাস্যরস স্যাটায়ারে পরিণত হয়নি। জীবনে দারুণ শোক পেয়ে রাজশেখর গল্প লেখা ছেড়ে দিয়ে রামায়ণ মহাভারত চর্চা করেন। অভিধানচর্চাও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। এই পর্যায়ের রচনা একান্ত সীরিয়াস। পরশুরামকে বিদায় দিয়ে রাজশেখর স্বনামেই লেখনী চালনা করেন। 'চলন্তিকা' ইতিমধ্যে স্টাণ্ডার্ড হয়ে গেছে। রামায়ণ মহাভারতও গদ্যশৈলীর আদর্শ। বছর কুড়ি তিনি কঠিনকে সহজ করার সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। তার পরে আবার তুলে নেন গল্পের কলম।

শেষ পর্যায়ের গল্পগুলি— যেমন, 'ধুস্তুরী মায়া'— কতকটা ফ্যানটাসি জাতীয়। হাস্যপরিহাসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণে স্যাটায়ারও ছিল। মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি বোধ হয় মোহমুক্ত হয়েছিলেন। হয়তো ভিতরে ভিতরে তিক্ত। প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে সুরের মিল ছিল না। তবে সেই মুনশিয়ানা অব্যাহত ছিল। আমার তো মনে হয় শিল্পকর্ম হিসাবে 'ধুস্তুরী মায়া' পর্যায়ের গল্প-গুলি আরো বেশী কুশলতার পরিচায়ক। তবে ছবি না থাকায় তেমন কৌতুক-কর নয়।

'চলন্তিকা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমি আর ছাত্র নই, আমিও একজন লেখক। সাহিত্যক্ষেত্রে আমার অগ্রজপ্রতিম সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অভিধানটির সম্বন্ধে আমার মত জানতে চান। আমি তাঁকে লিখি যে, 'আইবড়' কথাটির মূল সংস্কৃত শব্দ 'অব্যূঢ়' অর্থাৎ অবিবাহিত। 'আয়ুর্বৃদ্ধ' নয়। আর 'বিরজা' একটি নদীর নাম নয়, একটি দেবীর নাম, তাঁর অধিষ্ঠান যাজপুর। ছেলেবেলায় তাঁর মন্দির দেখেছি। সুরেশবাবু এর উত্তরে আমাকে জানান, রাজশেখরবাবু মানতে রাজী নন যে 'আইবড়' এসেছে 'অব্যূঢ়' থেকে। তবে তিনি মেনে নিলেন যে 'বিরজা' একটি দেবীর নাম, যেহেতু আপনি ওড়িশায় তাঁকে দেখেছেন। বলা বাহুল্য, সুরেশবাবু ছিলেন রাজশেখরবাবুর সহকর্মী।

'চলন্তিকা'র দ্বাদশ সংস্করণ আমার হাতের কাছে আছে। খুলে দেখছি তিনি 'আইবড়' কথাটির অর্থ ঠিকই লিখেছেন। অর্থাৎ পরে আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন। অথচ 'বিরজা'র বেলা লেখা হয়েছে 'রাধার সখীবিশেষ।' আমি যাঁকে দেখেছি তিনি কিন্তু তা নন। যতদূর মনে পড়ে শাক্তদের দেবী। বৈষ্ণবরা স্বতন্ত্রভাবে রাধারই মন্দির বানায় না, সঙ্গে থাকেন কৃষ্ণ। রাধার সখীবিশেষ যাজ-পুরে পূজিত হন না। কোথাও কি হন? এটাও কি ঠিক যে, 'বিরজাক্ষেত্র' মানে

'জগন্নাথধামে ?' আমি জগন্নাথধামে বাস করেছি। সে ধামে বিরজা বলে কোনো দেবীর অস্তিত্ব নেই। যাঁর আছে তাঁর নাম বিমলা। বিরজাক্ষেত্র হচ্ছে যাজপুর। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য অভিধান পৌরাণিক অভিধান নয়। একে বাস্তবানুগ হতে হবে। পুরাণে কত কী লেখা থাকে। তার স্থান পৌরাণিক অভিধানে। কিন্তু 'মরণোত্তর সংস্করণের জন্যে' রাজশেখরবাবুকে দায়ী করছিনে।

পরবর্তীকাল তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু কবে তা ঠিক মনে পড়ছে না। মানুষটি ছিলেন গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। কেউ কখনো তাঁকে হাসতে দেখেছে কি না সন্দেহ। আমি যতদূর জানি তিনি হাসতেন না, হাসাতেন। যদিও তাঁর লেখা পড়ে মনে হবে 'আপনি আচরি হাস্য অপরে শিখায়।' না, আমি তাঁকে যতবার দেখেছি কোনোবারই হাসতে দেখিনি। এটা তাঁর প্রকৃতিগত। জীবনে তিনি অপার শোক পেয়েছেন বলে নয়। তাঁর কন্যাশোকের বৃত্তান্ত আমি শুনেছি। জামাতারও অকালমৃত্যু ঘটে। অত্যন্ত বেদনাবহ অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে ঘটনার আগেই তো লেখা হয়ে যায় প্রথম পর্যায়ের গল্পের বইগুলি। রাজশেখরবাবু আপনাকে সামলে নিয়েছিলেন। ভিতরে বিচলিত হলেও বাইরে অবিচলিত ছিলেন। তিনি গীতারও গদ্যানুবাদ করেছিলেন। সম্ভবত গীতার শিক্ষা অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমার কেমন যেন ধারণা তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী নন, দার্শনিক। আর তাঁর জীবন-দর্শন ছিল তাঁদেরই মতো গ্রীকরা যাদের বলত স্টোইক।

সারাজীবন অনলসভাবে তিনি কর্তব্য সম্পাদন করে গেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁর হাতে গড়া কীর্তি। সাহিত্যের প্রতি রুচি তাঁর তরুণ বয়স থেকেই। অথচ বিজ্ঞান তাঁকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্য সেটা পারত না। বিজ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে তিনি সাহিত্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। আর সে সাহিত্য তাঁর হাতে হয়ে ওঠে রসসাহিত্য। রসের ফল্গুধারা অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হচ্ছিল বলেই এটা সম্ভব হল। এমনটি আর কারো জীবনে ঘটেনি। তিনি অদ্বিতীয়।

পরশুরাম

বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের আবির্ভাব একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। পাঠকরা কেউ তখন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন না। রবি শশীর মতো রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তখন তাঁদের খ্যাতির চূড়ায়। তাঁদের উপরেই সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি। অজানা এক নক্ষত্রের মতো পরশুরামের উদয়। প্রথমে মনে হয়েছিল এ এক ধূমকেতু। পুচ্ছের আঘাতে ধর্মব্যবসায়ী গুরু পুরোহিতদের পতন ঘটিয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবে। পরে দেখা গেল ইনি ধ্রুবতারা হতে এসেছেন। পরশুরাম ব্যতীত এর আরো এক পরিচয় আছে। ইনি রাজশেখর। তথা রসশেখর। ইনি নীরস কথাও সরস করে বলতে জানেন। তাই এঁর মননশীল প্রবন্ধও সুখপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিদায় নিলে আমাদের সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিষ্ক হলেন প্রমথ চৌধুরী ও রাজশেখর বসু।

রাজশেখর স্বনামধন্য লেখক হলেও লোকে তাঁকে একডাকে চিনত পরশুরাম বলে। আমরাও আমাদের কথাবার্তায় তাঁর নিজের নাম ব্যবহার না করে ছদ্মনাম ব্যবহার করতুম। সংস্কৃতসাহিত্যে রাজশেখর বলে একজন বিশিষ্ট কবির স্থান আছে। তিনি যদি গোড়া থেকেই রাজশেখর নামে লিখতেন তা হলেও তিনি বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট আসন পেতেন। কিন্তু তাঁর বোধহয় ধারণা ছিল যে সাহিত্য তার স্বধর্ম নয়, সাহিত্যের রাজ্যে কেউ তাঁকে ঠাঁই দেবে না, তাঁর যা বলার আছে তা তিনি ছদ্মনামেই শুনিয়ে যাবেন। আর তা এমন কিছু বেশী নয়। 'পরশুরাম' ছদ্মনামটিও তিনি পুরাণ থেকে বেছে নেন নি। এক স্যাকরার নাম পরশুরাম। সেই সূত্রে তিনিও পরশুরাম। কিন্তু যাই ভেবে তিনি ও নাম ধারণ করে থাকুন ওই নামটিই ওকে সাহিত্যে সনাক্ত করে। সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি দ্বিতীয় এক পরশুরাম। যাঁর হাতের কলমই তাঁর কুঠার। সে কুঠার দিয়ে তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চান নি। কিন্তু সব রকম ভণ্ডামি আর হামবাগ ছিল তাঁর চক্ষুের বিষ। তিনি সোজাসুজি আঘাত হানতেন না। আঘাতের পাত্রকে হাস্যকর করে তুলতেন। কেউ প্রাণে মরত না। বরং কেউ কেউ অমর হয়ে যেত।

পরশুরাম যখন সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ।

ততদিনে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর মন পেকেছে। কিন্তু কী জানি কেমন করে তাঁর হাতও পেকেছে। এর জন্যে তাঁকে দীর্ঘকাল শিক্ষানবিশী করতে হয়নি। হয়ে থাকলে সেটা অন্তরালেই হয়েছে, কেউ টের পায়নি। এ যেন কুঠার হস্তে পরশুরামের জন্মগ্রহণ। পুরাণেও সেকথা লেখে না। "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" পাকা হাতের লেখা। লিখতে লিখতে লেখা ক্রমশ সাবলীল হয়॥ 'চিকিৎসাসঙ্কট' এমন জীবন্ত রচনা যে আজকের দিনেও তা সমান সরস 'গড্ডলিকা'র প্রায় সব ক'টি গল্প আর 'কজ্জলী'র অধিকাংশ গল্প এতদিনে ক্লাসিক হয়ে গেছে। যাদের নিয়ে গল্প তারা সবাই এখন আমাদের সুপরিচিত চরিত্র। যেমন শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী তেমনি গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, তেমনি তারিণী কবি-রাজ ও হাকিম সাহেব, তেমনি চাটুজ্যে মশায় ও বকু দত্ত। তেমনি ভূতপ্রেত ও ছাগল। তেমনি বিরিঞ্চি বাবা।

পরশুরামের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মতো তাদের সুভাষিতগুলিও আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। তারিণী কবিরাজের ইংরেজী জেড দিয়ে উচ্চারিত 'জান্‌তি পারো না'। চাটুজ্যের 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক'। গণ্ডেরিরামের 'আশরফিলালকা পুন যদি সোলহ্‌ লাখকা হয় মেরা ভি অস্‌সি হাজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা।' প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই এরূপ সদুক্তিকর্ণামৃত বিকীর্ণ। পরশুরামের উইট আর হিউমার যেন কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডল। আরো যেসব গল্পের বই তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তাদের মধ্যেও এই দুটির অভাব নেই। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ তাঁর গল্প তত্ত্বপ্রধান হয়। তিনি ছিলেন বহুবিদ্য পুরুষ। বহু বিদ্যার বাহন হয় তাঁর গল্প। তবু কোথাও রসাস্বাদন ব্যাহত হয় না। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তিনি সংসার প্রচলিত নীতিতে বিশ্বাস না করলেও উচ্চতর নীতিতে বিশ্বাস-বান। একটা না একটা 'মরাল' তাঁর অধিকাংশ গল্পেই প্রচ্ছন্ন। সেদিক থেকে তিনি একজন মরালিস্ট বা নীতিবিদ। যদিও একই কালে আর্টিস্ট বা শিল্পী। নিছক আমোদের জন্যে লেখা তিনি বড় কম লেখেন নি, কিন্তু আমোদ অনেক সময় পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের সগোত্র।

আরো একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরশুরাম প্রয়োজন হলে রূপকথার বা রূপকের আশ্রয় নেন। রাক্ষসী যেমন রাজকন্যার রূপ ধারণ করে, 'ষষ্ঠীর কৃপা'য় মেনী বেড়াল তেমনি মেনকায় রূপান্তরিত হয়। আর গোকুল গোস্বামী হয়ে যান বেড়াল। নিপুণ পরশুরাম এইভাবে তাঁকে সাজা দেন। পুত্রকন্যার চাপে পত্নীর

মৃত্যুব জন্যে যে পুরুষ দায়ী তার উপযুক্ত শাস্তি ষষ্ঠীর বাহন হযে বেড়াল বংশ বৃদ্ধি করা।

মানুষ যেমন বেড়াল হয তেমনি বাঘও হয। সেটাও একপ্রকাব নৈতিক পরিণাম। বাস্তব জীবনে তেমনটি হয না। কিন্তু রূপকথায হয। গাঁজাখুবি গল্পেব আড্ডায ছাগও বাঘ হয। চাটুজ্যেব মুখে শোনা যায, একদিন চবণেব বাডিতে ভোজ— লুচি, পাঁঠার কালিযা, এইসব। আঁচাবার সময দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম— দেখছ কি চবণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয কব —কাচ্চাবাচ্চা নিযে ঘব কব, প্রাণে ভয় নেই ? চবণ শুনলে না। গবীবেব কথা বাসী হলে ফলে। তারপব থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বছর পরে মশায সেই ছাগল সোঁদববনে পাওযা গেল। শিং নেই বললেই হয, দাডি প্রায খসে গেছে, মুখ একেবাবে হাঁডি। বর্ণ হযেছে কাঁচা হলুদ। আব তাব ওপর দেখা দিযেছে মশায়— আঁজি আঁজি ডোবা ডোরা। ডাকা হল— ভুটে ভুটে। ভুটে বললে— হালুম। লোকজন দূব থেকে নমস্কাব কবে ফিবে এল।'

এই গাঁজাখুবিব পেছনেও রযেছে একপ্রকাব প্রচ্ছন্ন নীতিবোধ। রাজশেখব বাবু ছিলেন নিবামিষাশী। আট বছর বযসেই মাছ মাংস ঘৃণায ত্যাগ কবেন। ইঁদুর কলে পডলে ছেড়ে দিতেন, মাবতেন না। এটা তাঁব দাদা শশিশেখবেব জবানবন্দী। তাঁব ছেলেবেলায় লোকে বলত, বাজশেখব বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবে। তাঁব এই জীবে দযা তাঁকে কথাসাহিত্যিকরূপে প্রভাবিত কবেছে। তিনি যেন প্রকাবান্তরে বলতে চান ছাগ যদি বাঘ হয়ে মানুষেব ঘাড মটকায তা হলেই মানুষেব উপযুক্ত কর্মফল হয।

সবচেযে মজাব গল্প 'ভেডা'। তার নাম পরে পরিবর্তিত হযেছে। এখন তাব নাম 'কামরূপিণী' অর্থাৎ কামরূপের নাবী। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি কামরূপে গেলে সেখান থেকে পুরুষেবা ফেরে না। কামরূপেব মাযাবিনীরা পুরুষ দেব ভেডা বানায়। ছেড়ে দেয় না। তার মানে কামরূপে যারা যায় তাবা নাবীব বশ হয। পবশুরাম এই নিযে তামাশা করেছেন। বলভদ্র মর্দরাজ কামরূপে গিযে নারীর রূপে মুগ্ধ হযে ভেডা বনে যান। তার পবে সেই ভেডার কী গতি হলো কেউ তা জানে না। সন্দেহ, সে চলে গেছে রান্নাঘর থেকে খাবার টেবিলে। মায়াবতী মর্দরাজের কন্যার বিবাহ হয় যাঁর সঙ্গে তিনিও পরে নিরুদ্দেশ হন।

সন্দেহ, তিনিও ভেড়া বনে যান ও ভেড়া থেকে খানা। আপাত বীভৎস এই গল্পের পেছনেও প্রচ্ছন্ন আছে পরশুরামের জীবে দয়া, মেষমাংসের প্রতি ঘৃণা, যারা মেষমাংস খেতে ভালোবাসে তাদের প্রতি তিরস্কার। তারা কি হৃদয়ঙ্গম করে যে ওটা মেষের নয়, মানুষের মাংস?

নিছক গল্পের খাতিরে গল্প তিনি দেদার লিখেছেন। এমন নয় সে তাঁর সব গল্পই গল্পচ্ছলে শিক্ষাদান। তিনি যখন তাঁর ভাইদের সঙ্গে বাস করতেন তখন তাঁদের বাড়িতে বিরাট আড্ডা বসত। কলকাতার শিক্ষিত মহলের ছোট বড়ো সবাই সেখানে জড়ো হতেন। রাজা উজীর মরত, ভরিভোজন হতো। রাজ-শেখরও ছিলেন একজন আড্ডাধারী। আড্ডার মেজাজটা তিনি বরাবর বজায় রাখেন তাঁর নয়খানি গল্পসংগ্রহে। কলম দিয়ে লেখা হলেও এগুলি মুখে মুখে বানানো গল্প। বীরবলের সঙ্গে এক্ষেত্রে পরশুরামের মিল দেখা যায়। তিনিও ছিলেন একজন আড্ডাধারী। তবে তাঁর বেলা সেটা আড্ডা নয়, ফরা-সীরা যাকে বলে সালঁ (salon)। যাতে নারীর কর্ত্রীত্ব। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ছিলেন তেমনি একটি সাঁলর অধিষ্ঠাত্রী। বীরবল জানতেন যে স্বয়ং চৌধুরানী তাঁর গল্প শুনছেন। তাই তাঁকে নারীপ্রসঙ্গে সতর্ক থাকতে হতো। তেমন সতর্কতা বাঙালী ভদ্রলোকদের আড্ডায় আশা করা যেত না। পরশুরামরা পরিহাসচ্ছলে বা তর্কচ্ছলে নারীদের প্রসঙ্গে যা বলতেন তা অন্দর থেকে ওদের গৃহিণীরা শুনতে পেতেন না, তাই পরশুরামের গল্প অপেক্ষাকৃত নিরঙ্কুশ। ফ্রয়েডের দোহাই দিয়ে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যা ইন্দিরা দেবী হলে অনুমোদন করতেন না। মৃণালিনী বসুও না। পরশুরামের রচনাতেই ইনহিবিশন কম। তবে তিনি অশ্লীলতা বা অশালীনতা একেবারেই পছন্দ করতেন না। 'শালা' কিংবা 'শালী' পর্যন্তই তাঁর দৌড়। আদিরসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় পুঁথিগত। প্রেম সম্বন্ধেও তাঁর উপলব্ধি সেইটুকু যেটুকু সমাজসম্মত। ছাত্র বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায় গুরুজনের নির্বন্ধে।

বীরবলেরই মতো পরশুরামেরও ছিল প্রবন্ধের হাত। সেক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর দোসর রাজশেখর বসু। 'সবুজপত্রের' সম্পাদকরূপে প্রমথ চৌধুরী যেমন একদিকের দিক্‌পাল তেমনি রামায়ণ মহাভারতের সারানুবাদকরূপে রাজশেখর বসুও অপরদিকের দিক্‌পাল। কৃত্তিবাস কাশীদাসের যুগে তাঁরা যা করে গেছেন আমাদের যুগে তাই করে গেলেন রাজশেখর বসু। রামায়ণ মহাভারতকে তিনি

সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করে গেলেন। অথচ তাঁদের চেয়ে মূলানুগত। আমার তো মনে হয় তাঁর অধিকাংশ গল্পের চেয়ে তাঁর রামায়ণ মহাভারতই তাঁকে অমরত্ব দেবে। প্রত্যেকটি বাক্যই অতি যত্নের সঙ্গে লেখা। যেমন তেমন করে কাগজের পৃষ্ঠা ভরানো তাঁর কাজ নয়। সংক্ষেপীকরণের তিনি চূড়ান্ত করেছেন। যাঁরা মূল মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পড়তে চান তাঁদের জন্যে রয়েছে কালী-প্রসন্ন সিংহের তথা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহামূল্য অনুবাদ। কিন্তু মূল রামায়ণের তেমন কোনো প্রামাণিক অনুবাদ পাওয়া যায় না। পূর্ণাঙ্গ না হলেও রাজশেখরবাবুর রামায়ণ মহাভারত প্রামাণিক গ্রন্থ। এর জন্যে তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেছেন।

'চলন্তিকা'ও তাঁর অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ। হাতের কাছে রাখার জন্যেই এই সংকলন হয়েছে। নয়তো তিনি বৃহত্তর অভিধান লিখতে চেষ্টা করতেন। সে যোগ্যতাও তাঁর ছিল। তবে সেই অনুপাতে সময় ছিল না। বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার হিসাবে তাঁকে কর্মব্যস্ত থাকতে হতো। অবসর নেবার পরেও তাঁর কাজ ছিল পরামর্শ দেওয়া। মূলতঃ রাজশেখরবাবু ছিলেন কর্মীপুরুষ। যাকে বলে ম্যান অভ অ্যাকশন। দিনভর কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা আড্ডা। সাহিত্যের জন্যে তিনি সময় পাবেন কখন ও কতটুকু ? সময় মেলে বেঙ্গল কেমি-ক্যালের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর। সেটা ১৯৩২ সালের ঘটনা। তখন তাঁর বয়স বাহান্ন। বিয়াল্লিশ থেকে বাহান্ন এই দশ বছরে তিনি পরশুরাম রূপে কুঠার চালিয়ে সাহিত্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পরে প্রবন্ধকার, সারানুবাদক ও অভিধানকার রাজশেখর রূপে তাঁর অতিরিক্ত প্রসিদ্ধি। শেষের দিকে আবার গল্পের উপরে ঝোঁক। সেটা কিন্তু আরোহণপর্ব নয়, অবরোহণপর্ব। সেই পর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয়। তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছি। উদার অকপট স্নেহ। তাঁর চেহারা দেখলেই মনে হতো ইংরেজীতে যাকে বলে 'নোব্‌ল্'।

বাঙালী পলটনের শেষচিহ্ন

বাঙালী পলটনের শেষচিহ্নটুকুও লোপ পেল। মাহবুবউল আলম চলে গেলেন। বাংলাসাহিত্যের একমাত্র সৈনিক লেখক। কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা সৈনিক কবি বলে থাকি বটে, কিন্তু মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র অবধি তিনি যাননি, করাচী থেকেই ফিরে এসেছিলেন। আর মাহবুবউল আলম যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে লিখেছিলেন "পলটন জীবনের স্মৃতি"। বাঙালী পলটন ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে, কেউ তার কথা লেখেন না, তার জন্যে গর্ব বোধ করেন না, স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় সৈন্যদলে বাঙালী জওয়ানদের কোনো রেজিমেণ্ট নেই। সুতরাং মাহবুবউল আলম সাহেবের সাক্ষ্য একটি অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল। বিশেষ করে এই কারণে যে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বা পরে আর কখনো বাঙালী হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মার্চ করে যায়নি, লড়েনি, বন্দী হয়নি, মরেনি ও ফিরে এসে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দৃষ্টান্ত দেখায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালীর "নন্-মারশিয়াল রেস" অপবাদ ঘুচেছে, কিন্তু হিন্দু বাঙালীর তাতে কতটুকু অংশ! কাঁধে কাঁধ মেলানোর নতুন দৃষ্টান্ত কোথায়!

মাহবুবউল আলমের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৩৩ সালে তখনকার দিনের 'বুলবুল' পত্রিকায়। শামসুন নাহার ও তাঁর ভাই হাবিবুল্লাহ বাহার তার যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদিকা। অমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকা সচরাচর দেখা যায় না। তাতে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। মাহবুব সাহেব লিখছিলেন 'মোমিনের জবানবন্দী' নাম দিয়ে তাঁর নিজের জীবনের প্রথম বয়সের স্মৃতি। ভাষা, শৈলী, বিষয়, জীবনদর্শন সমস্তই অভিনব। কয়েক কিস্তি পড়ার পরেই আমি বুঝতে পারি যে এই লেখক সাধারণ লেখক নন, ইনি গভীর প্রত্যয় থেকে লেখেন, ইনি প্রকৃতই একজন মোমিন। অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলমান। অথচ এঁর দৃষ্টি উদার ও মানবিক। আর এঁর বিচার ও বিবেক সৃষ্টিশীল। এঁকে ঠিক মোল্লা মৌলভী বা মৌলানার মতো মনে হয় না। এঁর লেখা জীবনরসে পূর্ণ। সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ। এঁকে মুসলিম সাহিত্যিক

বলে এক কোণে সরিয়ে রাখা যায় না। ইনিও একজন বাঙালী সাহিত্যিক।

তিনি কে, কী করেন, কোথায় থাকেন এসব আমার জানা ছিল না। ঘটনাচক্রে ১৯৩৭ সালে আমি চট্টগ্রামে বদলী হই। একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন দুই স্থানীয় সাহিত্যিক। আশুতোষ চৌধুরী ও মাহবুবউল আলম। লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে আশুবাবু ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি নিজেও একজন কবি। 'পূরবী' নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক তিনি ও মাহবুব সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওয়াহিদুল আলম। বেনামীতে মাহবুব স্বয়ং। স্বনামে সম্পাদনা করা চলত না, কারণ তিনি সরকারী চাকুরে। যুদ্ধ-ফেরৎ সাবরেজিস্ট্রার। পত্রিকাটিতে বহু যত্নের পরিচয় ছিল। চট্টগ্রামের লোক-সঙ্গীতের বিচিত্র নিদর্শন আমাকে আকর্ষণ করে। এদের দু'জনের সঙ্গে আমার বার বার সাক্ষাৎ হয়। একবছরের মধ্যে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠি। তার পর আমি ছুটি নিই ও বদলী হই। আমার পোষা হরিণটি আমি দিই আশুবাবুর ছেলেদের। এই ঘটনার প্রায় চল্লিশ বছর বাদে সেই হরিণের গল্প পড়ি ঢাকার 'সচিত্র সন্ধানী' পত্রিকায়। লিখেছে আশুবাবুর ছেলে সুচরিত চৌধুরী। তা পড়ে আমিও একটি ছড়া লিখতে উদ্বুদ্ধ হই।

আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয় মন্বন্তরের সময় তাঁর অকালমৃত্যুতে। আকালমৃত্যুও বলতে পারি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে ধানচালের দর হুহু করে বেড়ে গেছে, অন্নাভাবে সংসার অচল। মাহবুব সাহেব মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর লেখা বই উপহার পাঠাতেন। ছোট ছোট অনেকগুলি বই তিনি লিখেছিলেন। 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' তাদের অন্যতম। 'মফিজন' বলে একটি উপন্যাসিকাও ছিল। 'গোঁফ সন্দেশ' নামে হাসির গল্প। 'পঞ্চ অন্ন' নামে একটি বই, যার নামের মানে পঞ্চান্ন বছর বয়স। এটিও রসরচনা। দেশভাগের পর তাঁর ও আমার চিঠিপত্র একত্র করে তিনি প্রকাশ করেন 'সংলাপ। এটা হিন্দু মুসলমানের বিয়োগান্ত কলহ নিয়ে বাদবিবাদ। তিনি লোকবিনিময়ের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু পাকিস্তানের সমথক ছিলেন। আমাদের বন্ধুতায় চিড ধরে। দেশভাগের পর তিনি একবার কলকাতা আসেন। কাজী আবদুল ওদুদ ও আমি তাঁর সঙ্গে মিলে ফোটো তোলাই। দুই মুসলমান লেখকের মধ্যে কত তফাৎ! একজন আগে বাঙালী, তার পরে মুসলমান। আরেকজন আগে মুসলমান, তার পরে বাঙালী। কিন্তু

দু'জনেই খাঁটি মুসলমান, দু'জনেই খাঁটি বাঙালী।

মাহবুব সাহেবের বংশে কেউ কখনো বাংলায় লেখেননি, লেখাপড়াও করেননি। তাঁরা আরবী, ফারসী ও উর্দুতেই দোরস্ত ছিলেন। বাড়ীতে পড়া হতো মুসলমানী বাংলায় লেখা পুঁথিসাহিত্য। চট্টগ্রাম এমন এক জেলা যেখানে বাংলা পুঁথির হরফ ছিল আরবী। আলাওলের 'পদ্মাবতী'র পাণ্ডুলিপিও আরবীতেই লেখা। যদিও ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা সাধু বাংলা। মাহবুব সাহেব সচেতন ছিলেন যে তাঁর নিজের জেলা চটগ্রামের সংস্কৃতি ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম এই তিনের মিশেল। তাকে বিশুদ্ধ ইসলামী করা বৃথা। তাঁর সাহিত্যকর্মকে তিনি ধর্মের বাহন করতে চাননি। তাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সকলের কাছেই আদরণীয়।

তাঁর চিঠিগুলিও খুব যত্ন করে লেখা। হাতের লেখা অতি পারিপাটী। তিনি সেকালের আরবী লিপির ক্যালিগ্রাফি বাংলা লিপিতেও মক্স করেছিলেন। ওটা একটা আর্ট। সাধু বাংলাতেই তিনি লিখতেন, কারণ চটগ্রামের চলতি বাংলা অন্যত্র দূর্বোধ্য। আর কলকাতার বাঙালীদের চলতি বাংলা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ওপারের বাঙালীরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এপারের চলতি বাংলাকেই আপনার করে নিয়েছেন। খবরের কাগজের ভাষা এপারের চলতি বাংলা। মাহবুব সাহেব আরবী ফারসীর মোহ ছাড়লেও সাধুভাষার অভ্যাস ছাড়তে রাজী ছিলেন না, কিন্তু শেষ বয়সে তাঁকেও চলতি ভাষায় লিখতে দেখা গেল। ততদিনে তিনিও খবরের কাগজের সম্পাদক হয়েছেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সেই হয় তাঁর পেশা কিংবা নেশা। শুনেছি তাঁর কাগজ তিনি নিজেই পায়ে হেঁটে গিয়ে ঘরে ঘরে বিলি করতেন। কায়িক অক্ষমতার পর পত্রিকার ভার পুত্রকে দেন। নিজে স্মৃতিচিত্র লেখেন। এক তাড়া পাঠিয়েছিলেন আমাকে। অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশের মুক্তির পর ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। টেলিভিসনের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে আমি চট্টগ্রাম থেকে আগত আমার এই পুরাতন বন্ধুকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে উপন্যাস লিখতে বলি। লিখলেনও তিনি বিরাট এক মহাভারত, কিন্তু উপন্যাস নয়, ইতিহাস। পাঠিয়েও দিলেন আমাকে এক

কপি। অনুরোধ করলেন এপারে প্রকাশক খুঁজতে। ততদিনে বাংলাদেশ সম্বন্ধে এপারেব জনমত উদাসীন হয়েছে। অনেকের তো বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। প্রাক্তন সৈনিকেব এই সাহিত্যকীর্তিব মূল্যায়ন পবে হবে। আপাতত তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বেব প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন কবেই আমি ক্ষান্ত। তাঁব আত্মাব শান্তি হোক।

মনীষী আবুল ফজল

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক আবুল ফজল ছিলেন আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি আর নেই। এর কিছুদিন পূর্বেই আমি হারিয়েছিলুম তাঁব চেয়েও পুরাতন ও তেমনি অকৃত্রিম বন্ধু তাঁরই শ্বশুর বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক তথা সৈনিক মাহবুবউল আলমকে। দু'জনেই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। দু'জনেই অসুস্থ ছিলেন। সুতরাং তাঁদের মহাপ্রয়াণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। তা হলেও মনে খেদ থেকে গেল কেন লিখি লিখি করে চিঠি লিখিনি, নানা কাজেব ধান্দায় ভুলে গেছি।

দু'জনেই চট্টগ্রামের মুসলমান, তবু মানুষে মানুষে কত তফাৎ! 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনেব সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন ও 'শিখা' পত্রিকায় লিখতেন আবুল ফজল ছিলেন তাঁদেব একজন। ডিরোজিয়োর 'ইয়াং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর সঙ্গেই এঁদের তুলনা করা চলে। লোকের অপ্রিয় হয়ে কেউ কেউ লেখা ছেড়ে দেন, কেউ কেউ ঢাকা ছেড়ে চলে আসেন, কেউ কেউ মুসলিম জনমতের সঙ্গে আপস করেন। আবুল ফজল কিন্তু বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল সূত্রগুলি যথাসম্ভব রক্ষা করেন। অথচ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেন না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পব শেখ মুজিব তাঁকেই করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ছাত্রদের উপরে তাঁর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব। বাংলা সাহিত্যের এম. এ.। থীসিস লিখে ডক্টরেট চাননি। অধ্যাপনার দিক থেকে তাঁর চেয়ে যোগ্যতব পাত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আস্থাভাজন তাঁর মতো আর কেউ নন। সর্বব্যাপী উচ্ছৃঙ্খলতা ভালোবাসার শাসন দিয়ে সামলাতে পারতেন একমাত্র আবুল ফজল।

শেখ মুজিবের নিধনের পর একমাত্র তিনিই মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেন। তা নিয়ে বইও লেখেন। সে সাহস আর কারো ছিল না। সেনাপতি জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন তখন শিক্ষা পরামর্শদাতা রূপে আবুল ফজলকেই নিযুক্ত করেন। সম্মানের পদ, কিন্তু বিবেকে বাধে। অনেক অত্যাচার দেখেন ও বরদাস্ত করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর চেয়েও স্বাধীনচেতা। উমবতুল একদিন স্বামীর উপর রাগ করে ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে যান। এদিকে সরকার

নাছোড়বান্দা, ছাত্র সমাজকে আবুল ফজল ছাড়া আর কে সামলাতে পারে? ওদিকে ঘরণীর পণ অমন স্বামীর ঘর করে পাপের ভাগী হবেন না। স্বামীকেই হার মানতে হলো। একদিন পদত্যাগ করে তিনি চটগ্রামে ফিরে যান। সরকারী চাকরির সেইখানেই ইতি। এখানে বলে রাখি তিনি বহু-পূর্বেই সরকারী কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

একবার রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলে হিন্দু মুসলমান মিলে এক নেশন হতে পারবে না। হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তাঁর এক ছেলে হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে। তিনি সেই মেয়েটিকে সাদরে পরিবারভুক্ত করেন। কিন্তু ধর্মান্তরিত করেন না। স্বধর্মে নিষ্ঠা থাকলেও পরধর্মের মর্যাদা মানতেন। ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে আরো হয়েছে। কোনো কোনো স্থলে বর হিন্দু। সে ধর্মান্তরিত হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলে নামমাত্র। পূর্বনাম অপরিবর্তিত। শিক্ষিত মুসলিম সমাজে এ ধরনের বিয়ে এখন আর নিন্দিত নয়। মেয়েই হিন্দু বিয়ে করতে আগ্রহ দেখায়। বাপ মা কতদিন বাধা দেবেন?

মুক্তি যুদ্ধের সময় খান্ সেনা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গোপন তালিকায় এক নম্বর স্থান দিয়েছিল আবুল ফজলকে। সকলের আগে তাঁকেই কোতল করত। টের পেয়ে তিনি শহর থেকে পলাতক হন। গ্রামে গ্রামে লুকিয়ে বেড়ান। কিন্তু চট্টগ্রাম জেলার বাইরে যান না। মার্কা মারা অধ্যাপকদের অনেকেই কলকাতায় পালিয়ে আসেন। সেদিন দেখা গেল হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই। বাঙালী বাঙালীর দুর্দিনের সহায়। মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁরা স্বস্থানে ফিরে যান। আবুল ফজল তাঁর ডায়েরি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি খান্ সেনার অত্যাচারের বর্ণনা দেন। নিরীহ হিন্দুদের উপর উৎপাতের শরিক এক শ্রেণীর মুসলমানও। হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া বা দখল করা তাদের দুষ্কৃতির অঙ্গ। এটা মাহবুবউল আলমও তাঁর লেখা ইতিহাসে সমর্থন করেছেন।

নির্ভীক, সত্যসন্ধ, বিবেকী পুরুষ আবুল ফজল বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে গেছেন। একটি আমার অনুরোধে খাঁটি চাটগেঁয়ে কথ্য ভাষায়। বাইরের পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য। পরে অন্যান্য লেখকদের মতো পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন। সেটাই আজকাল বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের লেখার ভাষা। মাহবুব বরাবর সাধু ভাষাতেই লিখতেন, শেষে তিনিও সাধু ছেড়ে চলতি ভাষা

ধরেন। ওপারের নয়, এপারের চলতি ভাষা। বাংলাদেশের সব ক'টা খবরের কাগজেরই ভাষা এখানকার মতো। যতদূর মনে পড়ে, বাংলাদেশের একটি পত্রিকাই এর অগ্রণী। বাংলাদেশ সৃষ্টির বহু পূর্বে। ওপারের পত্রিকা আর এপারের পত্রিকায় ভাষাগত কোনো প্রভেদ নেই। স্কুল কলেজের বাংলাও একই রকম। অফিস আদালতের কী জানিনে।

আবুল ফজল ছিলেন মানবিকবাদী বা হিউমানিস্ট। এ বিষয়ে তাঁর বই আছে। তাঁর মতো ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত আমিও নই। অথচ তাঁর শৈশবের শিক্ষা মক্তবে মাদ্রাসায়। পিতা ছিলেন মসজিদের ইমাম। তাঁর ভবিষ্যৎ সেই পথে। কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায় ইংরেজী স্কুলে নাম লেখান। একটু বেশী বয়সে স্কুলের পড়ার আরম্ভ। যথাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা। বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান তখন কবির সঙ্গে আলাপ। 'বিচিত্রা'য় না কোথায় আবুল ফজল নাম দেখে আমি তো ঠাউরেছিলুম ওটা নাম নয়, ছদ্মনাম। পরে জলজ্যান্ত মানুষটিকে দেখি চট্টগ্রামে ১৯৩৮ সালে। মাহবুবই আলাপ করিয়ে দেন।

নানা কারণে বাংলার রেনেসাঁসে বাঙালী মুসলমানদের পাওয়া যায়নি। ওঁরা আসেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর কলকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আনুকূল্যে অথবা ঢাকার 'শিখা' গোষ্ঠীর সামিল হয়ে। সেইভাবেই নতুন একটা রেনেসাঁস আরম্ভ হয়। এটা পূর্ববর্তী রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীনপন্থীদের বিরূপভাব সত্ত্বেও এই রেনেসাঁস এখন অনেক দূর এগিয়েছে। এতদিন আবুল ফজলই ছিলেন এর পুরোভাগে। তাঁর শূন্যতা কারা পূরণ করবেন বলতে পারব না। কারণ তাঁর মতো দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা দুর্লভ। তবে তাঁরই হাতে গড়া নতুন প্রজন্ম নিশ্চেষ্ট থাকবে না। আবহাওয়া ক্রমেই উদারতার দিকে যাবে। তাঁর পত্নীও সুলেখিকা। উমরতুলের লেখা পড়ে আমি চমৎকৃত হয়েছি। নারীও এখন জাগ্রত। ওরা উঠবে।

নীহাররঞ্জন

রেনেসাঁসের মানুষ বলতে তাঁকেই বোঝায় যাঁর সর্ববিষয়ে আগ্রহ, সর্ব-ব্যাপারে কৌতূহল, সর্বকর্মে দক্ষতা, সর্বদিকে দৃষ্টি, সর্ব রসে রুচি, সর্ব রূপে অনুরাগ। যিনি দেবও নন, দানবও নন, মানব। পরিপূর্ণ মানব। যিনি কেবল-মাত্র ঋষিও নন, কেবলমাত্র রাজাও নন, কেবলমাত্র বীরও নন, কেবলমাত্র বিদ্বানও নন, কেবলমাত্র শিল্পীও নন, কেবলমাত্র কবিও নন, কেবলমাত্র কৃষকও নন, কেবলমাত্র শ্রমিকও নন, কেবলমাত্র নাগরিকও নন, কেবলমাত্র গ্রামিকও নন। জীবনটাকে যিনি এমনভাবে যাপন করেছেন যাতে সমাপ্তির পূর্বে যথাসম্ভব সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। অথচ বিশেষ কোনো কোনো বিভাগে যাঁর বিশেষ পারদর্শিতা।

একেই বলা হয় মানবিকবাদী বা হিউমানিস্ট আদর্শ। হিউমানিস্টরা ধার্মিক হতেও পারেন, না হতেও পারেন, কিন্তু মানবপ্রগতিতে বিশ্বাসবান। যিনি যতটুকু পারেন মানবপ্রগতিকে পূর্ণতার অভিমুখী করেন। এবং সেটা ইহলোকেই, পরলোকে নয়। ইহকালেই, পরকালে নয়। আধুনিক জগতের সব দেশেই আমরা এমন মানুষ দেখতে পাই। কিন্তু এরা কোনো দেশেই শত শত নন। অনেকেই যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যান। শুকনো ডালে ফুল ফোটে না ফল ফলে না। পণ্ডিত যিনি তিনি ঘোরতর পণ্ডিত, রাজনীতিক যিনি তিনি তুখোড় রাজনীতিক, কবি যিনি তিনি সাধারণের দুর্বোধ্য, চিত্রকর যিনি তিনি প্রকৃতির দিকে দৃক্‌পাত করেন না, বৈজ্ঞানিক যিনি তিনি নির্বিকারে মারণাস্ত্র নির্মাণরত।

রেনেসাঁসের মানুষ বলতে আমাদের দেশে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে তাঁরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি-না সন্দেহ, কিন্তু তাঁর মানবপ্রেম সুবিদিত। মধুসূদনও যে ধার্মিক খ্রীস্টান ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট রাক্ষস রাক্ষসীরাও মানুষ হিসাবে কারো চেয়ে খাটো নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বহু যত্ন করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণও মানুষ, তোমার আমার মতো মানুষের আদর্শ। অথচ এতকাল ধরে যা করা হয়ে এসেছে তা শ্রীকৃষ্ণের উপর দেবত্ব আরোপ।

মানবিক ব্যাপারে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের অশেষ কৌতূহল। যদিও তাঁরা কেবল রেনেসাঁসের নন, রেফরমেশনেরও নায়ক। জগদীশচন্দ্র কেবল মানবিক ব্যাপারে নন, জাগতিক ব্যাপারেও কৌতূহলী। সেই সঙ্গে ব্রাহ্ম সংস্কারকমণ্ডলীর অন্যতম। ব্রাহ্মসমাজকে বাদ দিয়ে বাংলার রেনেসাঁস সম্ভব হতে পারত, কিন্তু বাংলার রেফরমেশন অসম্ভব। সেই ব্রাহ্মসমাজেই রেনেসাঁসের মানুষ নীহাররঞ্জন রায়ের জন্ম। ব্রাহ্ম প্রভাবেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজেই তাঁর বিবাহ। সুতরাং তাঁকে রেফরমেশনের মানুষ বলেও গণ্য করতে পারা যায়। তাঁর পোজিশনটা মোটামুটি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মতো।

আগেকার দিনে যাকে আর্টস বলা হতো আজকাল তাকে বলে হিউমানিটিজ। বিজ্ঞান এর মধ্যে পড়ে না। অথচ বিজ্ঞানীরাও হিউমানিস্ট। নীহাররঞ্জনের বিজ্ঞানশিক্ষার সংবাদ আমি শুনিনি। তবে সোশিয়াল সায়েন্সকেও আজকাল বিজ্ঞানের কোঠায় ফেলা যায়। সেই অর্থে নীহাররঞ্জনও বিজ্ঞানচচা করে-ছিলেন। তার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর ঐতিহাসিক রচনায। তিনি নৃতত্ত্ব সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যার আলোকেই প্রাচীন যুগকে দর্শন করেছিলেন। তাঁর ইতি-হাসচর্চাকে বলা যেতে পারে ইণ্টারডিসিপ্লিনারি। এটা ভারতে অভিনব। যদুনাথ বা রমেশচন্দ্র যে অর্থে ঐতিহাসিক তিনি সে অর্থে নন। তার থেকে ভিন্ন অর্থে। যুগধর্মের কল্যাণে তিনি মার্কসীয় দর্শন তথা অর্থনীতিও অধিগত করে-ছিলেন। সম্ভবত মার্কসীয় চিন্তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেমন সুশোভন সরকার। প্রশান্তচন্দ্রের ভগ্নীপতি। আরো একজন ব্রাহ্ম। আরো একজন রেনে-সাঁসের মানুষ। আরো একজন রেফরমেশনের মানুষ। এঁদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেখে আমি দুঃখিত।

আজকাল মার্কসবাদী কে নয়? কিন্তু মার্কসবাদী হলেই যে কমিউনিস্ট হতে হবে তা স্বতঃসিদ্ধ নয়। সোশিয়ালিস্টও হতে পারা যায়। নীহাররঞ্জন সোশিয়ালিস্ট ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় কুমিল্লায়, ১৯৩৯ সালে। একদল ছাত্র এসে আমাকে তাঁর সভায় নিয়ে যায়। তাঁর ভাষণের কয়েকটি কথা এখনো মনে পড়ে। 'রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে, বড়বাজারের কাটা-কাপড়ের কারবার ঠাকুর পরিবারের একচেটে ছিল।' তখনকার দিনে মার্কসীয় সমালোচনার ধারাটাই ছিল এই ধাঁচের। এর থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে মুক্ত হন।

বশিষ্ঠের শিষ্যকে বিশ্বামিত্র ভুলিয়ে নিয়ে গেলেও ধরে রাখতে পারেন না। তেমনি ঋষি রবীন্দ্রনাথের শিষ্যকে মুনি কার্ল মার্কস। নীহাররঞ্জন হাড়ে হাড়ে রবি-ভক্ত। যেমন প্রশান্তচন্দ্র। বেছে নিতে বললে এঁরা মার্কসকে ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ-কেই বেছে নিতেন। এটা যুক্তির কথা নয়, ভক্তির কথা। এঁরা রবিসৌরমণ্ডলের অন্তর্গত বুধ বৃহস্পতি। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের ধর্ম থেকে অনেকদূরে সরে এসে-ছিলেন। তাঁর মতে ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের উপরেও তাঁর টান ছিল। সে ধর্ম ঈশ্বরনিরপেক্ষ। নীহাররঞ্জনও বৌদ্ধ যুগ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। বোধহয় তাঁরও টান ছিল সেই ধর্মের উপরে। আধুনিক ইউরোপের বহু মনীষী বাইরে খ্রীস্টান হলেও ভিতরে বৌদ্ধ।

নীহাররঞ্জনকে দ্বিতীয়বার দেখি মেদিনীপুরের সামুদ্রিক প্লাবনের পর। সালটা ১৯৪২। মাসটা নভেম্বর কি ডিসেম্বর। আমি তখন বাঁকুড়ার জেলা জজ। আমার কুঠিতে সেখানকার মেডিকাল স্কুলের ছাত্রদের যাতায়াত ছিল। আমার স্ত্রী তাঁদের স্কুলের সন্নিহিত হাসপাতালের সেবাকার্য দেখাশুনা করতেন। একদিন মেদিনীপুরনিবাসী একটি ছাত্র এসে কাঁদতে কাঁদতে জানায় যে সমুদ্রের ঢেউ এসে বিশ মাইল পর্যন্ত জায়গা জমি ডুবিয়ে দিয়ে গেছে, ঘরবাড়ী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মেদিনীপুরের জেলা শাসক তখন নিয়াজ মহম্মদ খান। তিনি কঠোর হস্তে আগস্ট আন্দোলন দমন করেছেন। মেদিনীপুর ধ্বংস হয়ে গেলেও তিনি বাইরে থেকে রিলিফ আসতে দেবেন না। দেবার যা তিনি নিজেই দেবেন ও রাজভক্ত-দেরই দেবেন। আমার স্ত্রী তাঁকে অমান্য করে মেডিকাল টীম পাঠান, আমি তাঁকে চিঠি লিখে অনুমতি চাই। ছাত্ররা বাধা পায় না। কিন্তু ওইটুকু রিলিফে কী হবে? কলকাতা গিয়ে আমি কংগ্রেসী বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে দেখা করি। সেখানে দেখা করি সেখানে নীহাররঞ্জনও ছিলেন। তখন তিনি জেল ফেরতা সত্যাগ্রহী। মনে হলো তিনি মার্কস মুনিকে ছেড়ে গান্ধী মহাত্মার খপ্পরে পড়ে-ছেন। সেখানে ওঁদের আমি প্রবর্তনা দিই কলকাতা থেকে রিলিফ নিয়ে মেদিনী-পুরে যেতে। গেলেন কি না জানিনে।

সবচেয়ে স্মরণযোগ্য সিমলার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ভবনে অর্থাৎ ভূতপূর্ব বড়লাট প্রাসাদে বড়লাটের খাস কামরায় নীহাররঞ্জনের দরবার। সেই কক্ষেই নাকি মাউন্টব্যাটেন ও জবাহরলাল মিলে ভারতভাগ্য বিধান করেন। নিভৃতে সুখদুঃখের কথা হলো। বিরাট এক নিখিল ভারতীয়

দায়িত্বভার বর্তেছে তাঁর উপরে। কিন্তু সিমলায় তিনি নিঃসঙ্গ। উপযুক্ত আবহাওয়া কোথায়? কাদের নিয়ে কাজ করবেন? একটু একটু করে গড়ে তুলতে হবে প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতো মহানাগরিকের পক্ষে ওটা যেন হিমালয়ে নির্বাসন। এত বড়ো দেশে এমন অত্যুচ্চ পদের জন্যে মনোনয়ন করা হয়েছে যাঁকে তিনি কি দেশের অগ্রগণ্য বিদ্যানাগরিক নন? আমি তাঁকে অভিনন্দন করি।

মাস কয়েক আগে শেষ দেখা 'প্রফুল্লকুমার সরকার পুরস্কার' প্রাপ্তি উপলক্ষে। তখন কি কল্পনা করতে পেরেছি যে, সেই তাঁর বিদায় ভাষণ? তাঁর ভাষণের মতো তিনিও চমৎকার। একান্তে গিয়ে বলি, 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী।' তিনি হাসেন।

বারো জনা

ঢাকায় তখন আমি জুডিসিয়াল ট্রেনিং নিচ্ছি। সালটা ১৯৩৩। আপাতত আছি অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের জন্যে নির্দিষ্ট কুঠিতে। যদিও সে পদের অধিকারী নই। এতে আমার পদবৃদ্ধি না হোক, মর্যাদাবৃদ্ধি হয়েছে। লোকে ঠাওরায় আমিই অ্যাডিশনাল জজ। এতে বিপদও আছে। কেমন, বলছি।

একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের রীডার ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর এসে আলাপ করেন। চটগ্রামে খাস্তগীর পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ভেবেছিলুম সেই সুবাদেই আসা। তা নয়, অন্য উদ্দেশ্য ছিল। বলেন, "আপনাকে আমরা আমাদের মধ্যে পেতে চাই। আমরা একটা মণ্ডলী তৈরি করছি। সভ্য সংখ্যা বারো জন। বারো জনের বাড়ীতে বারো মাসে বারোটা বৈঠক।"

এই বলে নামের ফিরিস্তি দেন। বেশীর ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিংবা অন্যত্র নিযুক্ত অধ্যাপকশ্রেণীর লোক। হংসো মধ্যে বকো যথা কেবল দু'জন। আর্থার হিউজ (Hughes) আর আমি। হিউজ আমার বছর কয়েকের সীনিয়র। তখন অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি খুব ভালো বাংলা বলতেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর রুচি ছিল। আর বাঙালীদের সঙ্গে সমানে মিশতেন। তিনি ইংরেজ নন, ওয়েলশ।

আই. সি. এস. বলতে হিউজ আর আমি। তেমনি সাহিত্যিক বলতে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি। আমি এককথায় রাজী হয়ে যাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মোহিতলাল মজুমদার কেন নেই, সুশীলকুমার দে কেন নেই, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কেন নেই। খাস্তগীর যা বলেন তার মর্ম তাঁদের নিলে মণ্ডলীটা বারো জনের থাকে না। অথচ থাকা চাই। তা হলে তাঁদের একজনকে নিয়ে আমাকে বাদ দিলে চলে না? এর উত্তর, "না। আপনাকেই আরো বেশী দরকার।"

তালিকায় অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের নামও ছিল না। ঐতিহাসিক হিসাবে নেওয়া হয়েছিল মাহ্‌মুদ হোসেনকে। যদিও তিনি রীডার। কী এর ব্যাখ্যা? জনা দুই মুসলমান না নিলেই নয়। হোসেন তাঁদের একজন, অন্যজন

হাসান। ইংরেজীর অধ্যাপক। পুরো নামটি মনে পড়ছে না। বাঙালী মুসলমান। অপরজন পশ্চিমা মুসলমান।

হিউজ আর হোসেন অবাঙালী। আর সকলে বাঙালী। বারোজনের তিন-জন অহিন্দু। আর সকলে হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম। খাস্তগীর ব্রাহ্ম, ললিত চাটোপাধ্যায় ব্রাহ্ম, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্রাহ্ম। অবশ্য এতকাল পরে ঠিক মনে পড়ছে না আর কেউ ব্রাহ্ম ছিলেন কি না। বলা বাহল্য হিন্দু বলে যাঁদেব পরিচয় তাঁদের অনেকেই বিদেশফের্তা ও উদারপন্থী। যেমন আমি।

আমাকে নিয়ে আটজনের নাম দিয়েছি। বাকী চারজনের নাম সত্যেন্দ্র-নাথ বসু, বিনয়কুমার সেন, সর্বাণীসহায় গুহ সরকার, প্রফুল্লকুমার গুহ। ঠিক মনে পড়ছে না ডকটর পি. কে. গুহ'র আদ্য নাম প্রফুল্ল কি না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইতিমধ্যেই বিশ্ববিখ্যাত। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সর্বজনপরিচিত। এঁদের একজনকে মণ্ডলীপতি করতে পারা যেত। কিন্তু খাস্তগীর বলেন মণ্ডলীপতি বলে কেউ থাকবেন না, প্রত্যেক বৈঠকে একজন হবেন মূল বক্তা। তাঁর ভাষণের পর আলোচনায় আর সকলে অংশ নিতে পারবেন। যাঁর বাড়ীতে বৈঠক তিনি সভাপতির কাজ চালাবেন।

"আমাদের এই মণ্ডলীর নাম কী হবে, আপনার উপবেই সেটার ভার।" খাস্তগীর আমাকে ভাবনায় ফেলেন।

আমি গোটাকতক নাম প্রস্তাব করি। তাঁর পছন্দ হয় না। অবশেষে মাথায় খেলে যায় "বারোজনা।" তা শুনে তিনি বলেন, "বেশ, এই নামটাই রাখা যাবে।"

সেটাই সকলের পছন্দ হয়। সভ্য বাছাইতে আমার হাত ছিল না। নাম বাছাইতে ছিল। আমিই ছিলুম সর্বকনিষ্ঠ। কৃতার্থ বোধ করি। ইতিমধ্যে হিউজ আমাকে বলেছেন যে ঢাকা ক্লাবে ইউরোপীয় না হলে মেম্বর হওয়া যায় না। মনটা অপ্রসন্ন ছিল। কই, চিটাগং ক্লাবে তো মেম্বব হতে বাধেনি।

কিন্তু "বারোজনা" একটা ক্লাব নয়। তার কোনো ঠিকানা নেই। চাঁদা নেই। সেক্রেটারি নেই। কাগজপত্র নেই। তা হলে কি ওটা একটা আড্ডা? আড্ডা দেবার জন্যে সভ্যরা চায়ের দোকানে বা কফিহাউসে জড়ো হন। প্যারিস হলে কাফেতে একত্র হওয়া যেত। এদেশে আড্ডা দিতে কোনো এক সদাশয় বাবুর বাড়ী গিয়ে ঘাড়ে চাপতে হয়। যদিও আমরা সবাই রমনায় থাকি তবু

এক পালকের পাখী নই। দু'জন সাহিত্যিক, চারজন বৈজ্ঞানিক, দু'জন ইংরেজীর অধ্যাপক, একজন ইতিহাসের অধ্যাপক, একজন কলেজের প্রিন্সিপাল, একজন সেকেণ্ডারি বোর্ডের সেক্রেটারি, আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট। আড্ডা দেবার মতো সময় কোথায়? বিষয়ই বা কোথায়?

ক্লাবও নয়, আড্ডাও নয়, "বারোজনা" একটা গোষ্ঠীও নয়। বারোজন সুধীর ভাববিনিময়ের বৈঠক। এক একদিন এক একটা বিষয় নিয়ে ঘরোয়া ভাষণ ও আলোচনা। প্রথম বৈঠকে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় "ময়মনসিংহ গীতিকা" থেকে মহুয়ার কাহিনী পড়ে শোনান। তাঁর পঠনের ধরন ছিল এত সুন্দর যে আমরা সবাই বিমুগ্ধ হই। চারুবাবু আমাদের কৌতূহল সঞ্চারিত করে দিলেন। সবটা পড়ে শোনাবার অবকাশ ছিল না। প্রশ্নবাণেরও মোকাবিলা করতে হলো।

"বারোজনা" যে একটা স্বয়ংসিদ্ধ ঘননিবদ্ধ কুলীন মণ্ডলী, যাতে আর কারো প্রবেশ নেই, এ রকম একটা ধারণা চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে দলাদলির অন্ত ছিল না। এটা হয় একটা নতুন উপলক্ষ। যাঁর বাড়ীতেই দেখা করতে যাই তিনিই ও প্রসঙ্গ তোলেন। সভ্যসংখ্যা মোট বারোজন কেন, তিনি নেই কেন, এটা শোনায় অভিযোগের মতো। অগত্যা মাঝে মাঝে অতিথি বক্তাকে আমন্ত্রণ করতে হয়। সভ্য না হয়েও স্বাগত। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাদের একজন। তাঁর তখন দারুণ প্রতিপত্তি। পরে তো তিনি উপাচার্য হন। কিন্তু বার বার অতিথি বক্তা আমন্ত্রণ করলে সভ্যরা সুযোগ পান না। মাসে একটার বেশী বৈঠকে কারো আগ্রহ ছিল না। সভ্য সংখ্যাবৃদ্ধি করলে গৃহকর্তার চা জলখাবারের খরচ বেড়ে যায়।

যিনি সব চেয়ে সক্রিয় সভ্য সেই ডক্টর খাস্তগীর বেশী বয়সে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে ব্যস্ত হলেন। আনন্দের কথা নিশ্চয়ই, কিন্তু বাকী এগারো জনকে সংযুক্ত করবেন কে? 'মালাখানি ছিল, ফুলগুলি আছে, নাইকো ডোর।" আর কেউ তাঁর মতো উদ্যোগী নন। বৈঠক ক্রমে অনিয়মিত হয়। আমিও হঠাৎ বদলী হয়ে ঢাকা থেকে বিদায় নিই। "বারোজনা" উঠে যায়।

বিশ একুশ বছর বাদে শান্তিনিকেতনে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আসেন উপাচার্য পদে। আমাকে দেখে কাছে টেনে নেন। "বারোজনা"র জন্যে মন কেমন করে দু'জনের। ততদিনে মুসলমানব্যতীত আর সকলেই ঢাকা থেকে প্রস্থান করেছেন। কেউ কেউ পৃথিবী থেকে। হিউজ তো সার্ভিস থেকে। আমিও তাই। একখানি

ফোটো ছাড়া আমাদের বারোজনকে একত্র পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। সত্যেন্দ্রনাথ সেখানি যত্ন করে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন।

হিউজের সঙ্গেও পরে একবার শান্তিনিকেতনে দেখা। চাকরি থেকে বিদায় নিলেও তিনি ভারত থেকে বিদায় নেননি। বিলেত থেকে মাঝে মাঝে আসেন ঐতিহাসিক গবেষণা করতে। পলাশীর যুদ্ধ তাঁর গবেষণার বিষয়। অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। কিন্তু তার জন্যে শান্তিনিকেতনে আসা কেন ? তিনি সেটা বলতে না চাইলেও আমরা জানতে পারি। তিনি বিয়ে করেননি। কয়েকটি বাঙালী ছাত্রছাত্রীকে পড়াশুনার খরচ দেন। তাদের খোঁজ খবর নিতে এসেছেন। পরে দিল্লীতে আবার দেখা। তাঁর ভাই সেখানে ব্রিটিশ হাই কমিশনের পদস্থ অফিসার। তিনি তাঁদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। হিউজ তখন আজমীরের মেয়ো কলেজে অধ্যাপনা করছেন। শখের চাকরি। পরে চলে যান দেহরাদুনের বিখ্যাত ডুন স্কুলে। আবার শখের চাকরি। এখন কোথায় তিনি জানিনে। ইউরোপীয়দের মধ্যে তাঁর মতো ভারত প্রেমিক দুর্লভ।

খাস্তগীরের সঙ্গেও শান্তিনিকেতনে দেখা হয়। তিনি সেখানে একটা বাড়ী কিনে বসতি করেন। তাঁর স্ত্রী বোধ হয় ততদিনে পরলোকে। সত্যেন্দ্রনাথের পরে তিনিও শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। মণ্ডলীর আর কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তবে অস্পষ্টভাবে স্মরণে আসছে ডক্টর পি. কে. গুহর মুখ। কলকাতায় তিনি কোন এক কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

একে একে অনেকেই চলে গেছেন পরপারে। কে কে ইহপারে আছেন খোঁজ রাখিনে। খোঁজ পেলে খুশি হতুম। ওঁদের স্নেহপ্রীতি কি ভুলতে পারি!

এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার প্রথম যৌবনের একটি বারোয়ারী উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা। উপন্যাসটি লেখা হবে ওড়িয়া ভাষায়। লিখবেন বারোজন লেখক-লেখিকা। "বাসন্তী" নামক সেই বারোয়ারী উপন্যাস ওড়িয়াতে এক ও অদ্বিতীয়। এখনো লোকে পড়ে। বারোজনের মধ্যে ন'জন লেখেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা। মহিলাদের মধ্যে একজন ও পুরুষদের মধ্যে চারজন এখনো জীবিত। আরেকজন বেঁচে আছেন কি না জানিনে। যাঁরা নিশ্চিতভাবে জীবিত তাঁরা কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিহর মহাপাত্র ও সরলা দেবী। অন্যতম লেখক আমিও এখন পর্যন্ত জীবিতদের দলে। গোটা তিনেক পরিচ্ছেদ দুই কিস্তিতে জুগিয়ে আমি বুঝতে পারি যে উপন্যাস আমার

হাত দিয়ে হবার নয়। ইউরোপে দু'বছর না থাকলে, অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে, বাংলায় না লিখলে ও বাংলাদেশে বাস না করলে "সত্যাসত্য" অলিখিত থেকে যেত।

তরুণতরুণীদের সাহিত্যিক সাহচর্যই ছিল আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। বারোয়ারী উপন্যাসটা "ভারতী"তে প্রকাশিত সেই নামের উপন্যাসের অনুসরণ। কাহিনীটা ও নামটা কালিন্দীর দেওয়া। "উৎকল সাহিত্য" সম্পাদক বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের আনুকূল্য না পেলে "বাসন্তী" কেবল অপ্রকাশিত নয়, অলিখিত থেকে যেত।

প্রবাদ পুরুষ

বাংলা প্রকাশন জগতের প্রবাদ পুরুষ স্বর্গত গোপালদাস মজুমদারের পূর্বজীবন ছিল তাঁর অগ্রজ বিপ্লবপন্থী জ্যোতিষচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ। ঝিনাইদহে অধ্যয়ন-কালে তিনি বাঘা যতীনেরও সান্নিধ্যে এসেছিলেন। একদা তিনি রিভলভার হাতে ঘুরতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন উনপঞ্চাশ বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠিত হয় তখন গোপালদাস ও তাঁর কলেজের সহাধ্যায়ী এক বন্ধু সৈনিকরূপে নাম লেখান। কিন্তু যুদ্ধে যাবার জন্যে ডাক যেদিন আসে সেদিন তিনি নিরুদ্দেশ। খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ তাঁকে আবিষ্কার করে বাঁচীর অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল অফিসে। সেখানে তিনি নাম ভাঁড়িয়ে কেরানীর কাজ করছেন। চাকরিটা গেল। পরে তাঁর বিপ্লবপন্থী বন্ধুরা তাঁকে আর একটা চাকরি জুটিয়ে দেন। সেখানে তাঁর নাম প্রমথনাথ বাঁড়ুয্যে। কর্তারা যখন তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন সার্টি-ফিকেট তলব করেন তখন তিনি আবার উধাও। সাতঘাটের জল খেয়ে তিনি স্থিতি পান আন্দামানফেরৎ বিপ্লবী নেতাদের মুখপত্র 'বিজলী' পত্রিকার পঁচিশ-টাকা বেতনের কর্মচারী রূপে। কিঞ্চিৎ উপরি আয়ের জন্যে তাঁর সহকর্মী বিধু-ভূষণ দে ও তিনি শ্রী অরবিন্দের পুস্তক পরিবেশনের ভার নেন। শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পেতে হলে কোনো একটা এজেন্সীর মারফৎ পেতে হয়। তাঁদের এজেন্সীর নাম রাখা হলো 'ডি এম লাইব্রেরী'। বিধুভূষণের পদবীর ইংরেজী আদ্যাক্ষর ও গোপালদাসের পদবীর ইংরেজী আদ্যাক্ষর যোগ করলে যা হয় তার সঙ্গে লাইব্রেরী জুড়ে এই নামকরণ। 'বিজলী' অফিসের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একটি আলমারি সম্বল করে এর গোড়াপত্তন।

'বিজলী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বারীন্দ্রকুমারের 'দ্বীপান্তরের কথা' নামান্তরিত হয়ে 'ডি এম লাইব্রেরী' থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে 'ডি এম' শুধু পুস্তকবিক্রেতা নয়, পুস্তক প্রকাশকও। এমন সময় দুই প্রতিষ্ঠাতায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, একমাত্র মালিক হন গোপালদাস। 'বিজলী'র প্রাণপুরুষ বারীন্দ্রকুমার পণ্ডিচেরী প্রয়াণ করলে ও 'বিজলী' হস্তান্তরিত হলে গোপালদাস আলাদা একটি দোকানঘর ভাড়া করে স্বাধীন ব্যবসায়ী হন। তবে বিপ্লবের ঝোঁক যেন কাটতেই চায় না। মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বদেশে ফিরে এলে

গোপালদাসবাবু তাঁর দু'খানি ইংরেজী বই প্রকাশ করেন। কিন্তু এবার যিনি তাঁর জীবনে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন তিনি বিপ্লবী নন, বিদ্রোহী। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে প্রকাশন জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেই অর্থে বিদ্রোহী না হলেও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণ লেখকরাও ছিলেন বাঁধন-হারা বিদ্রোহী। এইসব বাউণ্ডুলে বেকাব উন্মার্গগামীরাই যে একদিন বাংলা-সাহিত্যের নবযুগেব চালক হবেন সেদিন এটা আদৌ স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। এইসব কালো ঘোড়ার পেছনে বাজি রাখাব ঝুঁকি নিতে দেখা গেল স্বল্প মূলধনের প্রকাশক গোপালদাসকে। যাঁর নিজেরই চালচুলো নেই। লেখক চেনবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁব। কার কী ভবিষ্যৎ তিনি এক আঁচড়ে বুঝতে পাবতেন। ভুল ভ্রান্তিও বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে। তিনি পরে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীব সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। এঁদের জীবনীতে তাঁবও একটু স্থান থাকবে। যেমন শরৎচন্দ্রের জীবনীতে গুরু-দাসের স্থান তেমনি এঁদেব জীবনীতেও গোপালদাসের স্থান। বিশ্বেব যে কোনো সাহিত্যের ইতিহাস বিবাদ বিসংবাদে ভরা। বাংলা সাহিত্যই বা ব্যতি-ক্রম হবে কেন? জীবনী লিখতে গেলে ঝগডাঝাটির কথাও লিখতে হবে। গোপালবাবুও এব ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কাজীর জীবনীকারদেব অভিযোগেব পাত্র হয়েছেন তিনি। তাঁব নিজের জীবনী যদি কখনো লেখা হয় তাতে এর বিশদ আলোচনা থাকবে। আমি তাঁকে অনেকবার অনুরোধ করেছি আত্মজীবনী লিখতে। তিনি বাজী হননি। বলেছেন তাঁর মতো সামান্য লোকের আত্মজীবনী কে পডবে? এমন কী গুরুত্ব আছে তাঁব? কিন্তু যে যুগে তিনি বাস করেছেন সে যুগের লেখকদের খবর নিতে হলে তাঁব মতো একজন সাক্ষীর জবানবন্দীরও মূল্য আছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁর কাছে আমি এমন সব খবব পেয়েছি যা আব কারো কাছে পাইনি। পাওয়া সম্ভবও ছিল না। প্রতি সপ্তাহেই তিনি 'বিজলী'র জন্যে লেখা সংগ্রহ কবতে চৌধুরী বাড়ী যেতেন ও লেখা তৈরি না থাকলে লিখিয়ে নিতেন। চৌধুরী সাহেব মদে চুমুক দিতে দিতে লিখতেন শোনাতেন আর বলতেন, "গোপাল, কেমন হয়েছে?"

আমরা তাঁকে শত অনুরোধ সত্ত্বেও কলম ধরাতে পারিনি, তিনি নিজের হাতে নিজের কথা লেখেননি। নাছোড়বান্দা এক সাহিত্যিক বন্ধু তাঁর শেষ বয়সে তাঁকে দিয়ে যা বলিয়ে নিয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীঅনিলকুমার

ভট্টাচার্যের অনুলিখন পড়তে পড়তে মনে হয়েছে গোপালবাবুই যেন কথা বলছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গোপালদাস স্মরণে বিভিন্ন লেখকের স্বকীয় জবানবন্দী। এটা একটা রেকর্ড হয়ে থাকবে ও বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের অবশ্যপাঠ্য হবে। অসংখ্য লেখকের নাম আছে এতে যাঁদের তিনি ধরেছেন বা যাঁরা তাঁকে ধরেছেন। প্রায় ষাট বছরের প্রকাশনী অভিজ্ঞতা। তার পূর্বের প্রায় ত্রিশ বছরের বিপ্লবী অন্বেষণ।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ১৯৩০ সালে। অচিন্ত্যকুমারের বিবাহের বরযাত্রী হন তিনি ও কাজী নজরুল। আমি ওদের রওনা হবার আগেই বহরমপুর ফিরে যাই। অপ্রত্যাশিতভাবে আমারও বিবাহ হয় তার চার মাসের মধ্যেই রাঁচীতে। বরযাত্রী হন অচিন্ত্যকুমার ও গোপালদাস। ইতিমধ্যে গোপালবাবুর প্রস্তাবেই লেখা ও ছাপা হয় 'আগুন নিয়ে খেলা'। তারই রয়ালটি হয় আমার বিবাহের খরচের সংশ্রয়।

ভ্রমণকাহিনী লেখার কাহিনী

ভ্রমণকাহিনী লিখতে হবে এই ভয়ে আজকাল আমি ভ্রমণ করতেই যাইনে। যদিও আমন্ত্রণ বা আহ্বান মাঝে মাঝে পাই। বেরোবার আগে আমি বিস্তর পড়াশুনা করি, ফিরে আসার পরেও আরো পড়ি, আরো ভাবি। তারপর লিখতে বসি ভ্রমণকাহিনী। এই নিয়ে যদি সময় কেটে যায়, তবে উপন্যাস লিখব কখন? বিশেষ করে বড়ো মাপের উপন্যাস। তার জন্যেও দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হতে হয়। যদি তেমন কোনো দুরভিলাষ থাকে।

সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার স্বপ্ন ছেলেবেলায় রূপকথা শুনে ও পড়ে। রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়ও রূপকথার শেষে থাকে। সুতরাং আমার স্বপ্নেরও। বছর নয় দশ বয়সে আমাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনাতে হতো। তাতেও দেখি সমুদ্রযাত্রা, ভাগ্যপরীক্ষা, রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়। আরো বড়ো হয়ে যখন ইতিহাস পড়ি তখন জানতে পারি চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ভারত ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে যান সমুদ্রপথে সিংহল ও জাভা হয়ে। যাত্রীবাহী পালতোলা জাহাজ ছাড়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। ঘটনাটা খ্রীস্টোত্তর পঞ্চম শতকের। আরো আগে বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রার ও সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের কথা বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কোন্ দেশ থেকে যান তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে গুজরাট থেকে। কিন্তু সিংহলীরা নিজেরাই বলে বঙ্গ থেকে। আমার এক বাঙালী বন্ধুকে ওরা যে মানপত্র দেয় তাতে তাঁকে আত্মীয় বলে দাবী করা হয়।

সমুদ্রযাত্রার ঐতিহ্য রূপকথা, কিংবদন্তী, মঙ্গলকাব্য ও ছড়ার ভিতর দিয়ে চিরকাল বর্তমান ছিল, কিন্তু তাম্রলিপ্তি অব্যবহার্য হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রামই ছিল সবে ধন নীলমণি। সেখানে জাহাজ তৈরি হতো। সেখানকার লস্কররা দেশ-বিদেশে যেত। কালাপানী পার হওয়ার জন্যে তাদের সমাজচ্যুত হতে হতো না। কেন যে হিন্দুদের বেলা তেমন শাস্ত্রীয় বিধান আরোপ করা হয় তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ কেউ বলতে পারেন না। তবে তুলনা করে দেখতে পাচ্ছি প্রায় একই সময়ে ভারত, চীন ও জাপান একই রকম ঘরকুণো নীতি অবলম্বন করে। তারা দেশের বাইরে যাবেও না, দেশের বাইরে থেকে আর কাউকে আসতে

দেবেও না। মুসলমান শাসকরা অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুয়ার খোলা রাখতেন। আর হজ যাত্রার অনুশাসনটা না মেনে তাঁদের গতি ছিল না। বহির্বাণিজ্য ক্ষীণ হয়ে আসে। চট্টগ্রামের মতো গোটাকয়েক বন্দর ব্যতিক্রম। লস্কর বা জেলে শ্রেণীর লোকরাও মুষ্টিমেয়। ইণ্ডোনেশিয়া, ইণ্ডোচীন, মালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সিংহলের সঙ্গে যদি থাকে তো সেটা স্থল-পথে। সে পথও অতি দুর্গম।

কয়েক শতক পরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসীরাই উদ্যোগী হয়ে বাণিজ্য করতে আসে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে। শাসকরাই তাঁদের দেশের ধর্মপ্রচারকদের ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে পর্তুগীজরা নয়। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, হলাণ্ডে এক নবযুগের সূচনা হয়। ধর্মের আওতা থেকে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলা মুক্তি পায়। পরধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগে। এই যুগটাকে বলা হয় এনলাইটেনমেন্টের যুগ। যেসব ইউরোপীয় এদেশে শাসনকার্য উপলক্ষে আসেন তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে রামমোহন রায় এনলাইটেনমেন্টের ভিত্তিতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। এর জন্যে ইউরোপের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করে সাগরপারে যাত্রা করেন। তিনি রাজপুত্র না হলেও 'রাজা' খেতাবধারী। এতে ইউরোপীয় অভিজাত মহলে প্রবেশ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিছুদিন পরে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি এমন অকাতরে অর্থব্যয় করেন যে লোকে মনে করে তিনি একজন ইণ্ডিয়ান প্রিন্স। এঁরা কেউ ভাগ্য পরীক্ষা করতেও যাননি, রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়ের আশায়ও না। এঁদের পরে যাঁরা সাগরপারে যান তাঁরা সিভিলিয়ান ব্যারিস্টার বা অধ্যাপক হয়ে ফিরে আসেন, কেউ কেউ প্রেমেও পড়েন। তবে প্রেম থেকে পরিণয় রূপকথা বা মঙ্গল-কাব্যের মতো সুগম ছিল না।

ততদিনে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দর খুলে গেছে। প্রধানত বাণিজ্যের প্রয়োজনে। যাত্রীবোঝাই জাহাজ নিয়মিত যাচ্ছে আসছে। সুয়েজ খাল দিয়ে গেলে পনেরো দিনের মধ্যে মার্সেলসে পদার্পণ করা যায়। সেখান থেকে বিলেত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার পথ। মাঝখানে প্যারিসে ট্রেন বদল। ক্যালে থেকে ডোভারে চ্যানেল অতিক্রম। কতরকম উদ্দেশ্য নিয়ে কতরকম যাত্রী যান।

কেউ বা ধর্ম প্রচারের জন্যে, কেউ বা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, কেউ বা ব্যবসা বাণিজ্যের সুরাহার জন্যে, কেউ বা খেলাধুলা বা আমোদ-প্রমোদের জন্যে, কেউ বা নিছক দেশ দর্শনের জন্যে। বই লিখে ওদেশে ছাপানোর কথাও কারো কারো উদ্দেশ্য ছিল। সেটাও বহু লেখকের জীবনে সম্ভব হয়, কিন্তু তার থেকে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি একটা অভাবনীয় ঘটনা। সেটা অকস্মাৎ ঘটে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা টেগোরের জীবনেই। পোয়েট থেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রোফেট পর্যায়ে উন্নীত হন।

দেশে ফিরে তিনি তাঁর দাদার জামাতা প্রমথ চৌধুরীকে প্রবর্তনা দেন একটি নতুন পত্রিকা বার করতে। নাম রাখা হয় 'সবুজপত্র'। প্রমথ চৌধুরী বছর তিনেক বিলেতে থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছিলেন। তিনি ছিলেন বহুবিদ্য ব্যক্তি। সবরকম বইপত্র কিনতেন ও তারই মধ্যে ডুবে থাকতেন। ইতিমধ্যে তিনি সুরসিক লেখক রূপেও অন্যান্য পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত পরিসর পাননি। সাহিত্যিক মহলে তিনি নিঃসঙ্গ। 'সবুজপত্র' বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সমজদার সমাজে সাড়া পড়ে যায়। তাঁর পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায়ের কবিতা, উপন্যাস ও গল্প। ইউরোপের আধুনিকতম সাহিত্যের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা। প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল তাঁর দোসর। ছোটোখাটো একটা মণ্ডলীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অতুল-চন্দ্র গুপ্ত তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভাষায় এঁরা একটা যুগান্তর নিয়ে আসেন। চিন্তাধারায় এঁরা সর্বত্রগামী। রায়তদের সমস্যা নিয়ে যে এঁরা ভাবতেন না তা নয়। কতকটা লিবারল, কতকটা র‍্যাডিক্যাল এঁদের মতামত। এঁদের কালের পক্ষে এঁরা তরতাজা। ইউরোপের কয়েকটি দেশের সাহিত্যেও একদল 'সবুজ' বা 'গ্রীন' ছিলেন। চলতি ভাষার অভিমুখেই তাঁদের অভিযান। চিন্তাধারাও অনেকটা একই রকম।

বারো বছর বয়সে আমাদের হাই ইংলিশ স্কুলের ম্যাগাজিন রুমের ভার পেয়ে হাতে স্বর্গ পাই। হঠাৎ 'সবুজপত্র' আবিষ্কার করে হকচকিয়ে যাই। প্রথমেই পড়ি 'চার ইয়ারী কথা'র তিন নম্বর কথা। রিনি আমাকে টানে। ভিনাস ডি মাইলো আকর্ষণ করে। পরে সবটা পড়ি। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে না গেলে চলে না। যেতেই হবে একদিন না একদিন, যেমন করেই হোক। ইতিমধ্যে প্রস্তুত হতে হবে সর্বতোভাবে। ফরাসী বই একখানা যোগাড় করে

পড়ি। কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারিনে। তুটো বিদেশী ভাষা একই সঙ্গে শিখতে পারব কেন? ইংরেজী ছিল অবশ্যপাঠ্য। বাবা আমাকে ন'দশ বছর বয়স থেকেই স্বরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পড়তে দিতেন। বুঝি আর না বুঝি পড়তেই হবে। না বুঝলে ইংরেজী অভিধান দেখতে হবে। স্কুলপাঠ্য বই ছিল বিলেতে ছাপা। ওদেশের ছেলেদের জন্য লেখা। পুরস্কারও পেয়েছি বিলেতে ছাপা ছেলেদের বই। কিছু বুঝি, কিছু বুঝিনে। তবু পড়ে যাই। স্কুল লাইব্রেরীতে ছিল এনতার ইংরেজী বই। আমার সেখানে অবাধ প্রবেশ। নানা বিষয়ের বই নাড়াচাড়া করতে করতে একটি বিলিতী সিরিজের চারখানা বই আবিষ্কার করি। কেনা হয়েছে অনেকদিন আগে। কেউ পাতা কাটেনি। আমিই প্রথম পাঠক। নিষিদ্ধ বিষয়। সেক্স। খান তুয়েক পড়ে আর পড়িনে। পরে বুঝতে পারি বিলেত যারা যায় ওটাও তাদের জানা দরকার। কলেজে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কারের টাকায় একবার কিনি মারী স্টোপসের কেতাব। ইংরেজ প্রিন্সিপালের জ্ঞাতসারে, স্বতরাং নিষিদ্ধ নয়। ওটাও আমার প্রস্তুতির অঙ্গ। তখন জানতুম না যে যাওয়া হবেই। হলো আই. সি. এসে সফল হয়ে। সেটাও পূব পরিকল্পিত নয়।

ভ্রমণ করার স্বযোগ পাওয়া এক জিনিস, ভ্রমণ কাহিনী লেখায় অনুপ্রেরণা পাওয়া আরেক জিনিস। তেমন কোন অনুপ্রেরণা আমি আগে কখনো পাইনি। তেমন কোনো সংকল্প আমার ছিল না। এটা হঠাৎ মনে আসে 'বিচিত্রা'র আবির্ভাবে ও তার জন্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধে। লেখা শুরু হয়ে যায় বোম্বাইতে জাহাজ ধরার প্রাক্কালে। পথেই যার শুরু তার প্রায় সমস্তটাই লেখা হয় প্রবাসে। বাকীটুকু দেশে ফিরে এসে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওটা বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' পাঠেরই ফলশ্রুতি। ওর প্রস্তুতি চলছিল দশ বছর ধরে। আমার অজ্ঞাতসারে। শুধু ভাষা ও স্টাইলের দিক থেকে নয়, আইডিয়ার ও আইডিয়ালের দিক থেকেও। আমিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কামনা করেছি। প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিককে মেলাতে চেয়েছি। বাঙালীকে ইংরেজ ফরাসীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে হবে এটা আমারও অভিলাষ। বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উঠবে এটা আমারও সাধনা। তার জন্যে তাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়তে হবে, সামাজিক সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে। গতানুগতিক জীবনধারা থেকে মুক্ত

হতে হবে। সাত সাগর তেরো নদীর পারে না যেতে পারলে এসব সম্ভব হবে না। এমনভাবে লিখব যাতে পাঠকের মনে বিদেশযাত্রার আগ্রহ জাগে। যারা যেতে পারবে না তারা অন্তত আমার লেখা পড়ে বিদেশের পরশ পাবে। পরে যারা আসবে তারা আমার কালের ভাবনাচিন্তার স্বাদগন্ধ পাবে। দেশদর্শন তো কেবল দৃশ্য অবলোকন নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের চেনাশোনা, ভাববিনিময়, মন দেওয়া নেওয়া। যেখানেই যাই সেখানেই চেষ্টা করি পরকে আপন করতে। প্রধান অন্তরায় ভাষাজ্ঞানের অভাব। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান আয়ত্ত করতে পারলে যেটা সহজসাধ্য হতো সেটা কেবলমাত্র ইংরেজী জেনে দুঃসাধ্য। ইংরেজমাত্রেরই উচ্চাভিলাষ উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে কন্টিনেণ্টে গ্রাণ্ড টুর করতে বেরোনো। আমার জীবনে সে উচ্চভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল। এর থেকে ভ্রমণ-কাহিনী উপজাত হলেও ভালো, না হলেও ভালো। পরে দেখা গেল 'সত্যাসত্য' শীর্ষক ছয় খণ্ড উপন্যাসও হয়েছে।

তেইশ বছর বয়সে আমি খোলা মন ও খোলা হৃদয় নিয়ে গেছি। বিয়ে করে গেলে বা বাগ্‌দত্তা হয়ে গেলে দ্বিতীয়টা সম্ভব হতো না। আমার উপন্যাসের নায়ক বাদলের জীবনের ট্র্যাজডী সেই থেকে। অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন সেটা কি নিবারণ করতে পারা যেত না? আমি বলেছি, না। ওর মতো অবস্থায় পড়লে আমারও একই দশা হতো। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েও দেখি আমার বিলেত যাওয়া হবে না, কারণ হাতে তিন মাসের খরচ নিয়ে যাওয়া চাই, সেটা সরকার দেবেন না, গুরুজনের সামর্থ্য নেই। কাকাদেব একজন বলেন, "বিয়ে করো, আমার কাছে প্রস্তাব এসেছে, সদ্‌বংশের মেয়ে, বৌকেও নিয়ে যেতে পারবে।" আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে আমাদের বংশে কেউ বরপণ দেয়ও না, নেয়ও না। এক সমাজসংস্কারক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি আমাকে বলেন তিন হাজার টাকার লাইফ ইনশিওরান্স করে তাঁর কাছে পলিসিটা বাঁধা দিতে। সুদটা ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের চেয়ে কিছু বেশী হওয়া চাই। আমি অকূলে কুল পাই। বিলেতে গিয়ে পরে সেটা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

হৃদয় খোলা রেখে না গেলে ভ্রমণও হতো, ভ্রমণকাহিনীও হতো, কিন্তু তাতে রং ধরত না। তেত্রিশ বছর বয়সে গেলে মনটাও কি খোলা থাকত? না, সেটাও সম্ভব হতো না। ততদিনে আমি ইংরেজদের উপর হাড়ে চটা।

ওরা মুসোলিনিকে আবিসিনিয়া দখল করতে দিয়েছে, হিটলারকে চেকো-স্লোভাকিয়া ছেড়ে দেবার তালে আছে। আর এদেশেও তো কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড চাপিয়ে দিয়ে ন্যাশনালিজম আর ডেমোক্রাসী দুটোকেই রাহুগ্রস্ত করেছে। যে দুটো ওদেরিই প্রবর্তন। তখন অবশ্য দুরবীণ দিয়ে দেখতে পাইনি যে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেশভাগ ও প্রদেশভাগ।

সকলের দৃষ্টিভঙ্গী একই রকমের নয়। কারো দৃষ্টি রসিকের দৃষ্টি, কারো ক্রিটিকের। কারো দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি, কারো পণ্ডিতের। কারো দৃষ্টি টুরিস্টের দৃষ্টি, কারো অনুসন্ধিৎসুর। কারো দৃষ্টি তীর্থযাত্রীর দৃষ্টি, কারো ধর্মপ্রচারকের। যাদৃশী দৃষ্টি সৃষ্টিও তাদৃশী। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কত ভাষায় কত বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী লেখা হয়েছে। অনেকগুলি কালোত্তীর্ণ হয়েছে। আমার বই হাল্কা হাতের লেখা। ওটা ভ্রমণকাহিনীও নয়। প্রবাসের জীবনযাত্রার ব্যক্তিগত ইমপ্রেশন। ও জিনিস বেশীদিন টিকে থাকার কথা নয়। তেমন কোনো মোহ আমার ছিল না। এখনো নেই। যুগটাই বাসী হয়ে গেছে। কিন্তু লেখক কী করে জানবে তার লেখার দৌড় কতদূর যাবে। সেকালের বহু ভ্রমণ-কাহিনী একালেও তাজা। তথ্যের জন্যে নয়, তত্ত্বের জন্যে নয়, রসের জন্যে, রূপের জন্যে। প্রাণশক্তির জন্যে, যৌবনশক্তির জন্যে। ভ্রমণকাহিনীও আর্ট হতে পারে। 'আর্ট' কথাটি আমি বারো তেরো বছর বয়সে 'সবুজপত্রের' পাতাতেই পাই। তখন থেকেই মনে গেঁথে যায়। তা নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা ও ভাবনাচিন্তা করি। টলস্টয়ের, রবীন্দ্রনাথের, রম্যা রলাঁর দিকে তাকাই। প্রমথ চৌধুরীই এক-মাত্র দিশারী নন। তাঁর মধ্যে একটা কাঠিন্য বা আঁটসাঁট ভাব ছিল। আমি ঢিলেঢালা মেজাজের মানুষ। খালি গায়ে থাকি, খোলামেলা জায়গা পছন্দ করি। বজ্র আঁটুনী আমার জন্যে নয়। বেশ রকম সামাজিক লোক হতে গিয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তির মূল্য দিয়েছেন। সেইখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা।

ঠিক সময়ে না পৌঁছলে আনা পাভলোভার ব্যালে দেখতে পেতুম না, পাডেরেভস্কির পিয়ানো তথা ক্রাইজলারের বেহালা শুনতে পেতুম না, শালিয়াপিনের গান শোনা হতো না, বার্নার্ড শ তথা বারট্রাণ্ড রাসেলের বক্তৃতা শোনা হতো না, রম্যা রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হতো না। বহু বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী ও অপেরা শিল্পীর তখনো জীবিত ছিলেন। কনসার্ট হলে, আর্ট গ্যালরিতে গিয়ে প্রতীচ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে অল্পসল্প পরিচিত হয়েছি। সেটা অবশ্য

নিছক পল্লবগ্রাহিতা। খানিকটে হীরো ওয়ারশিপও বটে। কেবলি মনে হয়েছে যে এঁদের তুলনায় আমি কীই বা করেছি বা এক জীবনে করে যেতে পারি! এঁদের উচ্চতার সঙ্গে তুলনীয় প্রাচ্যের ক'জনেরই বা উচ্চতা! স্বদেশে অতীত নিয়ে আস্ফালন করা বৃথা। বর্তমান নিয়ে গৌরব করার ক'তটুকু আছে? কচের মতো মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা যদি নিয়ে আসতে না পারি তো গরিব দেশের টাকা কেন বড়লোকের দেশে উড়িয়ে দিতে যাই? প্রোবেশনার হিসাবে যেটা পাই সেটা তো ভারত সরকারেরই দেওয়া। তার থেকে বাঁচিয়েই আমাকে ইউরোপের নানান দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ছেলেবেলায় আমার এক সহপাঠী ছিল, তার কাকা থাকতেন আমেরিকায়। সেই থেকে আমেরিকায় গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার সাধ লালন করেছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি। বিলেত থেকে আমেরিকা পাড়ি দেবার জোগাড় একবার হয়েছিল। পনেরো দিনের না তিন হপ্তার রাউণ্ড ট্রিপ। কোনোরকমে কুলিয়ে যেত। কিন্তু বন্ধু পরামর্শ দেন সেই খরচে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী বেড়ানো যায়। যদি দু'জনে মিলে বেড়াই। সেই ভালো। আমেরিকা এত বিশাল দেশ যে জাহাজে যাওয়া আসার দিন দশেক বাদ দিলে হাতে যে ক'টা দিন থাকে তা দিয়ে নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোর বুড়ী ছোঁওয়া যায়, তার বেশী নয়। ওটা হলো টুরিস্টের ভ্রমণ। টুরিস্টের মতো দর্শন। পেছনে বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছিল না। যেমন ইউরোপের বেলা।

একটা এ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোথাও মধ্যবিত্ত পরিবারে পেয়িং গেস্ট, কোথাও অভিজাত অথচ অভাবগ্রস্ত পরিবারে পেয়িং গেস্ট, কোথাও খ্রীষ্টীয় ধর্মশালায় সামান্য ব্যয়ে অতিথি, কোথাও ফোর্থ ক্লাস রেলগাড়ীতে চড়ে সসেজ খেয়ে মধ্যাহ্নভোজন, কোথাও রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে ট্রেন ধরা, কোথাও রাইনের বুকে বা ডানিউবের বুকে ষ্টীমারযাত্রা, কোথাও হোটেলের আরাম। লোকগুলি সব জায়গায় ভদ্র, সাহায্য করতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যায়। অথচ এরাই দশবছর আগে দানবের মতো লড়েছে। এগারো বছর বাদে মহা-দানবের মতো লড়বে। না, সে সময় আমরা অনুমান করতে পারিনি। তবে আমার সহজবোধ আমাকে বলছিল জার্মানীকে নিয়ে আবার বিপদ বাধবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়কে ওরা মন থেকে মেনে নেয়নি।

সঙ্গে একখানা বেডেকারস গাইড ও একখানা কুক্স টাইম টেবল থাকলে

অনায়াসেই কন্টিনেন্ট ঘুরে আসা যায়। কিন্তু বাঁধা পথে চললেও পদে পদেই চমক লাগে। কিছু না কিছু ঘটে যা অপ্রত্যাশিত। অ্যাডভেঞ্চার তো যৌবনের ধর্ম। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র ও কোটালপুত্রও তো অ্যাডভেঞ্চারেই বেরিয়েছিলেন। তবে আমরা কেউ রাজকন্যার দেখা পাইনি। যেটি আমার খোঁজে বার বার আসত ও দেখা পেলে প্রীত হতো সেটি একটি প্রিয়দর্শিনী দর্জি কন্যা। আপনারা হাসছেন যে! ওরাই তো এখন পূর্ব জার্মানী চালাচ্ছে। ওদের শ্রেণীর লোকই তো অর্ধেক ইউরোপের চালক। ভদ্রলোকরা কোথায়?

বানপ্রস্থের বয়সে জাপানে গিয়ে আমার একাধিকবার মনে হয়েছে, স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে কী ভুলই না করেছি! আমার কক্ষে তাঁর জন্যেও একটি শয্যা সংরক্ষিত ছিল। নিমন্ত্রণ কর্তারা ধরে নিয়েছিলেন যে অতিথিরা জোড়ে আসবেন। এসেওছিলেন একদল ফরাসী লেখক। জাপানীরা অত্যন্ত বিবেচক জাতি। তা নইলে এত উন্নতি করে! তাদের সরাইতে টেম্পোরারি ওয়াইফের জন্যে শয্যার একাংশ নির্দিষ্ট থাকে। মেজের উপর ঢালা বিছানা। যেমন নরম তেমনি চওড়া। লেপটাও কী মোলায়েম ও প্রশস্ত। এককথায় ফুলশয্যা। বৌ থাকলে বৌ। না থাকলে একজন মাসাজ করার জন্যে আপনা থেকে এসে হাজির হবেন। আমার এক বন্ধুর বেলা তেমন ঘটেছিল। তিনি যা বলেন তার মর্ম, "পতিযোগ্য নহি, বরাঙ্গনে।" কাওয়াবাতা যে উপন্যাসটির জন্যে নোবেল প্রাইজ পান সেই 'স্নো কান্ট্রি'তে এমনি এক সরাইতে একত্র স্নান ও একত্র শয়নের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। বিবাহিত পুরুষ। স্ত্রীকে তো বিত্রে করেই, সঙ্গিনীকেও নামমাত্র দস্তুরি দিয়ে বিদায় নেয়। যদিও বেশ বড়লোক।

এক এক দেশের এক এক আচার। অনুসন্ধান করলে অনেক কিছুই জানা যায়। কিন্তু সেরকম অনুসন্ধিৎসা আমার ছিল না। ইংলণ্ড প্রবাসের দ্বিতীয় বছর যখন আবার জার্মানীতে যাই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। ড্রেসডেনের এক সম্ভ্রান্ত হোটেলেই উঠি। যাঁর সঙ্গে যাই তিনি এক বিশিষ্ট মহিলা। উচ্চ-বংশীয়া। সঙ্গীত আর চিত্রকলা নিয়েই থাকেন। রাস্কিন, মরিস ইত্যাদির শিষ্যা। মোটা খদ্দর ছাড়া পরেন না। হাতে তৈরী জুতো ওখানে পায়ে দেন না। দীনহীনদের জন্যে তাঁর বান্ধবী এক আশ্রম চালান। সেইখানেই বছর দুই বাদে অতিথি হন মহাত্মা গান্ধী ও দলবল। জার্মানীতে আমরা এক হোটেলে উঠলেও এক ঘরে থাকিনে। যার যার ঘর তার তার। কখনো

দূরে দূরে কখনো কাছাকাছি। ড্রেসডেনে পাশাপাশি। এখন হয়েছে কী, আমার ঘরের দেওয়ালে যে একটা চোরা দরজা আছে সেটা আমি দৈবাৎ আবিষ্কার করি। আলমারির আড়ালে লুকানো। একটু এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে দরজাটা খুলে ফেলি। দেখি ওঘরে যাওয়ার পথ। বাইরের কেউ টের পায় না, ভিতরে যিনি শুয়েছেন তিনিই ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন। না, চোর নয়, ডাকাত নয়, আমিই। খেয়াল হয়নি যে ওটা অনধিকার প্রবেশ। প্রাইভেসী ভঙ্গ। দুটো একটা মিষ্টি কথা বলে পালিয়ে আসতে হয়।

আমি তখন অবিবাহিত। আমার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাওয়ার মূলে ছিল রূপকথা ও মঙ্গলকাব্যের শ্রীমন্ত উপাখ্যান। আমার বাল্য সহপাঠীর কাকাও তো চোদ্দ বছর বাদে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন কচের মতো দেবযানীকে বিয়ে করে। কচের মতো না হোক, হতে তো পারত। আমার গুরুজনকে দেখাবার মতো নজীর পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তবে বিদেশে থাকতে তেমন ভাগ্য হয়নি। দৈবাৎ বরাত খুলে যায় দেশে ফেরার পর। রূপকথা কখনো কখনো সত্য হয়।

ভ্রমণ থেকেই হয় ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু ভ্রমণকারীদের সকলের হাত দিয়ে নয়। যাঁদের হাত দিয়ে হয় তাঁদের যদি লেখার হাত না থাকে তো ঢের বেশী অভিজ্ঞতাও সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করে না। এক শুভার্থী আমাকে বলেছিলেন, "তুমি কীই বা দেখলে, কীই বা জানলে, বায়! আমার তুলনায় শিশু। তুমি লিখতে পারো, আমি পারিনে। তাই তুমি ফাঁকি দিয়ে নাম করে নিলে। আমি অচেনা অজানা থেকে গেলুম।"

না, ভুল লিখেছি। স্মৃতির ভুল। কথাটা বলেছিলেন আমার ভ্রমণকাহিনী পড়ে নয়, আমার ভ্রমণভিত্তিক উপাখ্যান পড়ে। উপাখ্যানে যতখুশি বানিয়ে বলার রেওয়াজ আছে। সকলেই জানে ওটা কল্পনাশ্রয়ী। 'চার ইয়ারী কথা' সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য চিরকালের মতো গোপন রয়ে গেল। প্রমথ চৌধুরী সেটা উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মুখে মুখে রচিত 'আত্মকথায়'। লিখে নিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পাণ্ডুলিপিটার কতক অংশ বই হয়ে বেরোয়। কতক দেওয়া হয় বুদ্ধদেব বসুকে। তিনি সেটা প্রেসে দেন। প্রেস ছাপে তার একাংশ। একাংশ নষ্ট হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। তাঁকে যা দেওয়া হয়নি তা ইন্দিরা দেবী আমাকে দেন কোথাও প্রকাশ করতে। আমি দিই

'পূর্বাশা'কে'। ছাপা হয়। সবচেয়ে আপসোসের কথা যে অংশটা নষ্ট হয় সেটাই ছিল বিলেতের প্রবাসবৃত্তান্ত। তাতেই ছিল এক সত্যিকার নারীর প্রসঙ্গ। সেই বিচিত্ররূপিনীই 'চার ইয়ারী কথা'র চার ইয়ারের চার নায়িকার মডেল। সম্ভবত চার নায়কও একই নায়কের রূপভেদ। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে ভাঙিয়ে যা বানিয়েছিলেন তাতে খাদ মেশানো ছিল বলে তা মেঁকি নয়।

ফাঁকি তখনি হয় যখন কেউ ভ্রমণকাহিনী লিখতে কলম ধরে সেই ছলে গাল গল্প ফেঁদে বসেন। পাঠকরা বিভ্রান্ত হন। সেটা সাহিত্যনীতিবিরুদ্ধ। সে রকম কাজ আমি কখনো করিনি। আমার ভ্রমণকাহিনীর থেকে আমি অনেক প্রসঙ্গই ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছি, দিলে সেসবও কিছু কম চটকদার হতো না। সত্য অথচ গালগল্পের মতো শোনাত। নিজেকে বা নিজের বন্ধুদের নায়ক করতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। নিজের বা তাদের বান্ধবীদের নায়িকা করতে তো কদাচ নয়। সাহিত্যেরও কয়েকটা বিধিনিষেধ আছে। লঙ্ঘন করলে ফ্যাসাদে পড়তে হয়। ভ্রমণকাহিনী থেকে কোনো কোনো প্রসঙ্গ বাদ যেতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে কাল্পনিক উপাখ্যান মিশিয়ে দেওয়া উচিত নয়। যদিও সেটাই বাজারে চলে বেশ। তার থেকে ফিল্মও হয়। হয় না যেটা সেটা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য।

মানুষমাত্রেরই অন্তরে একটি রাধা আছে। বাঁশি শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না। চেনে না লোকটা কে। জানে না লোকটা কেমন। তবু সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। পথ হয়তো অপথ বা বিপথ। পায়ে কাঁটা ফুটছে। রাত অন্ধকার। বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজছে। তবু তার যাওয়া চাই। আবার ঘরে ফিরবে কি না কে জানে। ফিরলে হয়তো কপালে ঝাঁটা আছে, লাথি আছে। প্রায়শ্চিত্ত বা সমাজচ্যুতি। হয়তো খেতে না পেয়ে মরতে হবে। তবু সে যাবেই। বাহির তাকে ডাকছে, বিদেশ তাকে ডাকছে। ঘর তাকে বাধা দিচ্ছে। দেশ তাকে টেনে রাখছে। কিন্তু বাঁশি যে তাকে পাগল করে তুলছে। আমারও একটা বয়সে সেই 'রাই উন্মাদিনী' দশা ছিল। কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পড়ে, ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমি আকুল বোধ করেছিলুম।

এমনি এক বাঁশির সুর শুনেছিলেন রামমোহন, শুনেছিলেন মাইকেল, শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র। শুনেছিলেন জগদীশচন্দ্র,

প্রফুল্লচন্দ্র, বিধানচন্দ্র। শুনেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত। শেষোক্ত তিনজন বাড়ী থেকে পালিয়ে কলকাতা বন্দরে জাহাজে চেপে হাওয়া হয়ে যান। আমরাও তিন বন্ধু—দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি— বোম্বাই থেকে জাহাজে উঠে সাগর পাড়ি দিই। যারা ঘরে পড়ে রইল তারা বাইরের কথা শুনতে চায়, তাদের শোনানো উচিত, এটাই ছিল আমার অন্তরের তাগিদ। ভিতর থেকে এই বাঁশির সুর শুনেই আমি লিখতে শুরু করি।

রুশ সাহিত্যকেও আমি ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্তর্গত বলে জানতুম। টলসটয়ের উপকথা পুরস্কার পেয়েই আমি তার থেকে একটি বাংলায় অনুবাদ করি। 'প্রবাসী' সেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে। বাংলাসাহিত্যে সেই আমার প্রথম পদক্ষেপ। তখন থেকেই আমি রুশ সাহিত্যের পক্ষপাতী পাঠক। রাশিয়া দেখে আসতে আমার ইচ্ছার অভাব ছিল না, ছিল অর্থের তথা অনুমতির অভাব। বছর দশেক পরে স্টালিনের অত্যাচারে মোহভঙ্গ হয়। স্বাধীনতার বছর দশেক বাদে বার দুয়েক সুযোগ পাই, কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠে না। সাহিত্যিক বন্ধুরা যাঁরা গেছেন তাঁদের প্রশ্ন করে জেনেছি তাঁরা সে দেশের কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে বা তাঁদের কথা শুনতে পারেননি। বছর দুই তিন থেকেও যে তাঁদের মন জেনেছেন তাও নয়। যেখানে মনের আদান প্রদান নেই সেখানে গিয়ে আমি যা শিখতুম তা বাড়ী বসেও শিখতে পারি। তাঁদেরকেই বা আমার কী বলার আছে? আমিও টলস্টয়, ডসটয়েভ্স্কি, টুর্গেনিভ, চেকভের মতো সেকেলে একজন লেখক। তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। ভারত প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলতে পারতুম। কিন্তু সেটাও তো গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের ভারত! স্বরাজোত্তর ভারত সম্বন্ধে গর্ব করার মতো কী আছে? আগে তো গর্ব করবার মতো কিছু দেখি।

চীন সম্বন্ধেও আমার ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু চীন ভারত সংঘর্ষের পর মন ভেঙে যায়। তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা শুনে মোহভঙ্গ হয়। জাপানে যাবার জন্যে তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করিনি, তবে আমার এক ভাইকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। চীনদেশে গেলে জাপানেও যেতুম, নয়তো নয়। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানে যাবার সুযোগ মিলে যায়। উপলক্ষ আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. কংগ্রেস। ভারতীয় কেন্দ্র

থেকে বেশ কয়েকজন বাছা বাছা সাহিত্যিক যাচ্ছেন, আমিও যেন যাই। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সাহিত্যিকরা আসবেন, তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপের উপযুক্ত স্থান কি জাপান? সেটা তো কট্টর জাতীয়তাবাদী দেশ। গিয়ে দেখি আশ্চর্য কস্‌মোপলিটান আবহাওয়া। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সত্যিকার মিলনকেন্দ্র। কংগ্রেস উপলক্ষে মিলিত হলেও আমরা অন্যান্য উপলক্ষ একই কালে পাই। আমি আরো কিছুদিন থেকে গিয়ে আরো বেশী দেখি ও শিখি। জাপানের বর্ষীয়ান সাহিত্যিকদের বাড়ী গিয়ে আলাপ করি। জাপানে এখন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। বর্ষীয়ানরা প্রাচ্যকেই ভালোবাসেন, প্রতীচ্যকে নয়। তাই কংগ্রেসে যোগ দেননি। সেখানে সবাই প্রতীচ্যপ্রেমিক। জাপানী চিত্রকলাতেও একই দোটানা।

কংগ্রেসে না হলেও তার বাইরে রুশপ্রেমিকও ছিলেন। তাঁরা মস্কো থেকে আনিয়েছিলেন বিখ্যাত বলশয় ব্যালে। ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন আমার কলেজ জীবনের চেনা। তাঁর অতিথি হয়েও কয়েকদিন কাটাই। তিনিই আমাকে নিয়ে যান বলশয় ব্যালে দেখতে। নইলে টিকিট পাওয়া যেত না। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের মধুর সম্পর্ক। তাই ব্যালেরিনা ও ব্যালে নর্তকরা তাঁর ভবনে ভোজ খেতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে মেশার সুযোগ মেলে। আরো একটি পার্টিতেও মিলেছিল। জাপানী বন্ধুদের সৌজন্যে থিয়েটারও দেখি। মঞ্চের আড়ালে গিয়ে কথাও বলি ও শুনি। পাপেট থিয়েটার জাপানের সম্পদ। সেটাও দেখা হয়, মঞ্চের আড়ালে গিয়ে আলাপও হয়। কাবুকিও দেখি, নো নাটকও দেখি। সব চেয়ে আনন্দ দেয় সেকালের বৌদ্ধ মন্দির ও মঠবাড়ী।

ইউরোপে আমি দু'বছর ছিলুম, জাপানে মাত্র একমাস। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী লিখতে গিয়ে দেখি আকারে জাপানেরটাই বড়ো। একবছর ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো লিখি। সেটা যখন বই হয়ে বেরোয় তখন একটা পুরস্কারও পাই। সেই সুবাদে পশ্চিম জার্মানী থেকে একটা নিমন্ত্রণও আসে। তাঁদের আগ্রহ দেখে আমিও আমার হারানো যৌবনকে চৌত্রিশ বছর বাদে খুঁজতে বেরোই। সেটা আমার বিস্মৃতির অতলে ফেরা। সেই সুযোগে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে দিন কয়েক কাটিয়ে আসি। সেটা আমার সেন্টিমেন্টাল জার্নি। একজন বাদে কেউ কেউ আমাকে চিনতে পারে না, আমিও কাউকে চিনতে পারিনে। সেই একজনেরও চেহারা বদলে গেছে। আমারও চেহারা কি একই রকম আছে? ভাগ্যে পুনর্দর্শন হলো। এ জন্মে আবার হবে তাঁর কিংবা আমার কারো সে বিশ্বাস ছিল না। দেখা গেল

অঘটন আজও ঘটে। সেটা হলো আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। তার জন্যে আমার নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

দেশে ফিরে আবার ভ্রমণকাহিনী লিখি। কম পরিশ্রম করিনি। কিন্তু এবারকার দিনগুলি 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল' তো নয়। সে ফীলিং পাব কোথায়? আর ফীলিং না থাকলে ভ্রমণকাহিনী হৃদয় স্পর্শ করে না। সবাই আজকাল আকাশপথে ইউরোপ ঘুরে আসছে, আমার কাছ থেকে নতুন কথা কী শুনবে? আমার এবারকার প্রধান কাজ ছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর ভাববিনিময়। সেটা আশানুরূপ হয়নি। আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের দিক থেকে আগ্রহ তেমন একটা নেই। যে-কোনো কারণেই হোক ভারত হচ্ছে ব্যাক নম্বর। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ভাঙিয়ে তো বেশী দিন চলে না। এত সব বাজে লোককে ওসব দেশে পাঠানো হয় যে ভারত সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা একান্ত স্বাভাবিক। তারপর ভারতের বৈদেশিক নীতি চক্ষুঃশূল। ওঁদের যারা শত্রু, কেন তাদের সঙ্গে ভারতের এত দহরম মহরম? তারপর ভারতের একাংশ পাকিস্তান নাম নিয়ে দিনরাত ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। তার দিকেই টান বেশী, কারণ তার সঙ্গেই সামরিক চুক্তি। পশ্চিমের লোকের ধারণা ভারতই কাশ্মীর আক্রমণকারী। ভারতের পক্ষে হাজার ওকালতী করলেও কেউ কর্ণপাত করবে না। ইতিমধ্যে ভারত গোয়া কেড়ে নিয়েছে। কালা আদমীরা গোরা আদমীদের ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে অপরাধের কি মার্জনা আছে? রাজনীতিকদের পিত্তি সাহিত্যিকদের ঘাড়ে চাপে। তা সত্ত্বেও আমি মনের মণিকোঠায় ঢুকতে পেরেছি। দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য টিকিট পেয়ে থিয়েটারে, অপেরায়, সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করেছি। তা ছাড়া পি. ই. এনের কল্যাণে পার্টিতে গেছি, ভবানী ভট্টাচার্যের আর আমার খাতিরে পার্টি দেওয়া হয়েছে। প্যারিসে পি ই. এনের অতিথিশালায় বিনা ভাড়ায় থেকেছি। লেখকদের মধ্যে ন্যাশনালিজমের চেয়ে আন্তর্জাতিকতাই প্রবল।

এক জীবনে কেই বা কতটুকু দেখতে পারে? দেখলে লিখতে পারে? লিখলে স্থায়ী সম্পদ রেখে যেতে পারে? বেশীর ভাগই হয়ে যায় সমসাময়িক বিবরণ। তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যেমন মেগাস্থেনিস বা হিউয়েন ৎসাঙের। তাঁরা কেউ সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁদের ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যও নয়। আমি বরাবরই সাহিত্যসচেতন, আর্টসচেতন। তা বলে আমার ভ্রমণকাহিনী রসোত্তীর্ণ হয়েছে এমন কথা আমি বলব না। কালোত্তীর্ণ হবে কি না মহাকালই জানেন।

উত্তরবঙ্গের একটি দিন

অসাধারণ টেলিগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন পতিসর পরিদর্শনে। তাঁর বিদায়-কালে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে আমাকে। রাজশাহী জেলার কলেক্টরকে। আত্রাইঘাট স্টেশনে তিনি কলকাতার ফিরতি ট্রেন ধরবেন। ট্রেনটার নাম নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। তার বার্তাটা বিলম্বিত হয়েছিল। হিসেব করে দেখি হাতে একঘণ্টার মতো সময়। তাড়াতাড়ি দুপুরের টিফিন খেয়ে নিয়ে মোটর করে ছুটতে হবে সদর থেকে নাটোর। সেখানে ধরতে হবে আত্রাইঘাট অভিমুখী প্যাসেঞ্জার। তা হলে আত্রাইঘাটে নেমে সাক্ষাৎ পাব আমার জেলার ক্ষুদ্র একটি জমিদারির মহত্তম মালিকের। যিনি আমার স্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক। শুধু আমার স্বদেশের কেন সারা বিশ্বের। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমাকে তিনি স্মরণ করেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাই। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী, বেলা দ্বিপ্রহর।

সালটা ১৯৩৭। মাসটা জুলাই। তারিখটা মাসের শেষদিন। যতদূর মনে পড়ে দিনটি ছিল বৃষ্টিহীন। আত্রাইঘাট স্টেশনে নেমে দেখি কবিগুরুর হাউস-বোট পতিসর থেকে ফিরেছে। নদীর ধারে তাঁর প্রজারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। বেশীর ভাগই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান। তাদের চোখ সজল। শুনলুম তারা সমস্ত পথ বোটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছে নাগর নদ ও আত্রাই নদীর পাড় ধরে। তার মানে ভোরবেলা থেকে বিকেল তিনটে কি চারটে অবধি না খেয়ে। হাউসবোট বাষ্পচালিত নয়। মাঝি মাল্লারাই চালায়। সবাই মুসল-মান ও সবাই জমিদারির প্রজা। আমাকেও এরা নিয়ে গেছে ওই হাউসবোটে করেই পতিসরে। যখন নওগাঁর মহকুমা হাকিম ছিলুম বছর চার পাঁচ আগে। ওটা একটা স্মরণীয় নদী পথযাত্রা। তীর্থযাত্রাও বলতে পারি। তবে পতিসরের জমিদার ভবন তখন জরাজীর্ণ ও বিবর্ণ। সেখানে কবির শ্যালক ও জমিদারির ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর বাস। আমি হাউসবোটেই অধিষ্ঠান করি। সপরিবারে। যেমন করতেন রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ। হাউসবোটটি এমনভাবে তৈরি যে সেখানেই দিনের বেলা টেবিল পেতে খাওয়া যায়, রাতের বেলা খাট পেতে শোওয়া যায়, অন্য সময় বসে কাজ করা যায়, দৃশ্য দেখা যায়। ওই একই

তক্তা হরেক ভাবে সাজানো যায়। হাউসবোট একাধারে হাউস ও বোট। শুনেছি ওই বোটটা রথীবাবুর ডিজাইন।

বোটে গিয়ে কবিকে প্রণাম করি। তিনি তখন বোট থেকে ঘাটে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গ নিই। বয়সের ভারে অবনত শরীর। আস্তে আস্তে পাটাতন বেয়ে ঘাটে ওঠেন। স্টেশনের সংলগ্ন। স্টেশনে ঢুকতেই সবাই তাঁর জন্যে পথ করে দেয়। তিনি বাইরে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে আসন নেন। পাশাপাশি পাতা হয় দু'খানা চেয়ার। তাঁর আর আমার জন্যে। প্রজারা ও আশেপাশে দাঁড়ায়। সামনে এসে পায়ের ধুলো নেয় কিংবা কদমবুসি করে। কবি তাঁদের আশীর্বাদ করেন। কেউ কেউ চোখের জল চেপে রাখতে পারে না। বলে, "এ জীবনে আর কি বাবুমশায়ের দর্শন পাব? আমাদেরও বয়স হয়েছে, হুজুরেরও বয়স হয়েছে।"

কবি আমার দিকে ফিরে মন্তব্য করেন, "এদের চোখে আমি শুধু একজন জমিদার নই। এরা কী বলে শুনবে? এরা বলে, পয়গম্বরকে তো আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। আপনাকেই দেখেছি।" শুনে আমি চমৎকৃত হই। এর মতো সম্মান মুসলমানরা আর কাউকে দেয় না। দিলে মুসলমানকেই দেয়। তাঁর প্রজাদের তিনি পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। আবার প্রয়োজন হলে শাসনও করতেন। সেটা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে। হাউসবোটের মাঝি মাল্লা চাকরবাকর বাবুর্চি খানসামা সবাই তো মুসলমান।

ট্রেন আসতেই কবি ও আমি একটি খালি ফার্স্ট ক্লাস কামরার দু'দিকের দুই লোয়ার বার্থ পেয়ে আরাম করে হেলান দিয়ে বসি। কবির একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ওঠেন পাশের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায়। খোঁজখবর নিতে আসেন মাঝখানকার স্টেশনে যখন গাড়ী থামে, তারপর নাটোরে, যেখানে আমি নামি। সেটা বোধহয় চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। সেই সময়টা কবিকে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে পাই। যেমনটি আর কখনো পাইনি। এটাই এবারকার সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্য। কথার তা পুরোপুরি প্রাইভেট।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে যত কথা বলেছিলেন তত কথা চার দশক পরে আমার স্মরণ থাকতে পারে না। তবে এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে তিনি আমাকে ছড়া লিখতে বলেছিলেন, শুধু তাই নয় কলকাতা ফিরে গিয়ে নিজের ছড়ায় গল্পে মেশানো বই 'সে' উপহার পাঠিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন তাঁর একটি অপূর্ণ

বাসনা পূরণ করতে। মহাভারত থেকে বিষয় নিয়ে একটি নাটক লিখতে। বিষয়টি তিনিই নির্দেশ করেছিলেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে অর্জুন যখন দ্বারকার নারীদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করেন তখন পথের মাঝখানে দস্যুরা এসে তাদের দলে দলে হরণ করে নিয়ে যায়। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব দিয়ে রক্ষা করতে পারেন না। তিনি অসহায়। ট্র্যাজেডী নয় তো কী? কিন্তু কবি একটু দুষ্টু হেসে বলেন, হরণটা একটা সাজানো ব্যাপার। প্রেমিকাদের সঙ্গে তাদের প্রেমিকদের বন্দোবস্ত ছিল যে ওরা দস্যু সেজে ধরে নিয়ে যাবে, এরাও স্বেচ্ছায় ধরা দেবে। আমি জানতে চাই তিনি একথা পেলেন কোথায়। তিনি তেমনি হেসে বলেন, মহাভারত থেকে। এত খুঁটিনাটি তিনি জানতেন।

নাটোর স্টেশনে তাঁকে বিদায় দিয়ে ও তাঁর একান্ত সচিব সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে বাক্য বিনিময় করে আমি আমার মোটরে উঠে বসি ও পৌনে একটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছে যাই। কুঠিতে পা দিতেই আমার অর্থাৎ কলেকটর সাহেবের প্রাচীন চাপরাশি শফী জমাদার আমাকে চেপে ধরে। "হুজুর, আপনি নাকি ঠাকুরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আত্রাই গেছলেন। তো আমাকে নিয়ে গেলেন না কেন?"

"কেন? তুমি কি তাঁকে চিনতে।" আমি আশ্চর্য হই।

"কী সুন্দর মানুষ ঠাকুরবাবু!" শফী গদগদ হয়ে বলে, "তার বয়সকালে তাঁকে আমি দেখেছি, তাঁর গান আমি শুনেছি। এসেছিলেন তিনি এখানকার জজ সাহেবের কুঠিতে গেস্ট হয়ে। পালিত সাহেব তখন এখানকার জজ। আহা, কী সুন্দর তাঁর গলা!" শফি যেন চল্লিশ বছর আগেকার তরুণ শফী।

তা ওর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি। সরকারী চাকরিতে কেউ চাপ-রাশি এতদিন থাকে না। শফি তখনো সবংশে বহাল। আমার নিজের বয়স তখন তেত্রিশ।

আর সব কাজ ফেলে রেখে আমার প্রথম কাজ হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত খুলে দেখা। কবি যা বলেছেন সত্যি কি তাই। হ্যাঁ সত্যি তাই। মহাভারতকারই লিপিবদ্ধ করেছেন যে দস্যুরা যাদের হরণ করে নিয়ে যায় তাদের কতক তাতেই খুশি। কবিকে আমি তখনি বলে দিয়েছিলুম আমার অত সাহস নেই যে আমি ওই অপ্রিয় সত্য নিয়ে নাটক লিখব। বিশ্ববিখ্যাত কবিরও যে সাহস হয়নি ছিয়াত্তর বছর বয়সেও।

নাটকটা আর কোনো সাহসিকের জন্যে অপেক্ষা করছে। তবে ছড়া লিখতে আমি সেদিন অক্ষমতা প্রকাশ করলেও বছর পাঁচেক বাদে হঠাৎ একদিন প্রেরণা পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নয়। সেদিনকার যাত্রার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়েছে। ছড়া লিখে আমি যে পরিমাণ প্রসিদ্ধি পেয়েছি আর কিছু লিখে সে পরিমাণ নয়। তার পর সেদিনকার যাত্রার ফলাফল কেবল সাহিত্যের দিক থেকেই নয়, জীবনের দিক থেকেও সুদূরপ্রসারী। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে সেই যে পরিচয় সেটা পরবর্তীকালে পর্যবসিত হয় বন্ধুতায়, আরো পরে আত্মীয়তায়। তাঁর পুত্রের আগ্রহে আমরা শান্তিনিকেতনে তাঁর জমির পাশে জমি কিনি, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই প্রস্তাবে একখানা আউট হাউস তৈরি করি, কিন্তু বসতবাড়ী তৈরি করতে এত দেরি হয় যে তার আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন। আমরাও নানা কারণে শান্তিনিকেতনে বাস করতে পারিনে, কলকাতায় ফিরে আসি। কিন্তু শান্তিনিকেতন ছাড়িনি, মাঝে মাঝে যাই ও সুধাকান্তদার সন্তান-দের প্রতিবেশী হই। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা

ছেলেবেলায় বিশ্বপথিক বিনয়কুমার সরকারের ভ্রমণকাহিনী 'গৃহস্থ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে পড়ে আমারও ইচ্ছে করত তাঁরই মতো পথে বেরিয়ে পড়তে, বিদেশের পত্রিকায় লিখে পাথেয় জোটাতে, সেইসূত্রে স্বদেশের কথা বিদেশে প্রচার করতে, আবার বিদেশের কথা বাংলায় লিখে স্বদেশে প্রচার করতে। এর মতো অ্যাডভেনচার আর কী আছে ? এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের মতো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাওয়া। হাতে অসি নয়, লেখনী। কে জানে একদিন রাজকন্যার সঙ্গেও বিয়ে হয়ে যেতে পারে। বিনয়কুমার সরকারের জীবনেও তেমন ঘটনা ঘটেছিল জাপান ও আমেরিকায় ঘুরে ইউরোপের মধ্যস্থলে ভিয়েনায়।

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। কলকাতার রাজপথে একদিন আমার আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় সফল সতীর্থ দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার আমাকে তাঁর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। পথের মাঝখানে দু'চার মিনিটের কথাবার্তা। তখনও আমি সাহিত্যক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা। কী বলে নিজের পরিচয় দেব ? আমি চুপ করে থাকি। দ্বিজেনই বলেন যে আমরা দু'জনে শিক্ষানবীশ হয়ে বিলেত যাচ্ছি।

বিলেত যাবার পথে ও বিলেত প্রবাসকালে ধারাবাহিকভাবে আমি যা লিখি তার নাম 'পথে প্রবাসে'। সে রচনা বিনয়কুমার সরকারের মতো বিবরণাত্মক নয়। কিন্তু একহিসাবে আমি তাঁরই উত্তরসাধক। তেমনি খোলা চোখে দেখি, খোলা মনে ভাবি, প্রাণ খুলে লিখি। তাঁর সঙ্গে আরো একটি মিল। আমিও এক বিদেশিনী রাজকন্যাকে বিয়ে করি। আক্ষরিক অর্থে রাজকন্যা নন যদিও।

বাংলার মফস্বলে নানান জায়গায় বদলীর চাকরি। কলকাতা এলে এত কম সময় থাকি যে বিনয়কুমার সরকারের মতো বিদগ্ধ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনে। ততদিনে তিনিও বাংলা মাসিকপত্রে বড়ো একটা লিখছেন না। যোগাযোগের তেমন কোনো সূত্র ছিল না। তবে তাঁর একটি ছাত্র আমাকে জানায় যে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের নির্দেশে সে আমার সম্বন্ধে কী যেন লিখেছে। তিনি আমার বই পড়েছেন ও প্রশংসা করেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহ বোধ করি। কিন্তু কোনো মতেই সুযোগ ঘটে না।

পার্টিশনের পর কলকাতায় বদলী হয়ে আসি। গুছিয়ে বসতে না বসতে আবার বদলীর হুকুম। যেতে হবে মুর্শিদাবাদ। সেখানে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ চলছে। ওরা একজন আই. সি. এস. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চান। কলকাতার পাট তুলছি, এমন সময় মনে হয় যাবার আগে একবার অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বাড়ী গিয়ে দেখা করা উচিত। যেই মনে হওয়া অমনি সেই সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন করে জানতে চাই তাঁর সঙ্গে কবে কখন দেখা হতে পারে। উত্তর পাই, 'আসুন, আসুন, এক্ষুনি চলে আসুন। আমরা আর কিছুদিন পরে আমেরিকা রওনা হচ্ছি।" আন্তরিকতাপূর্ণ আহ্বান।

বালীগঞ্জ থেকে এনটালি। কয়েক মিনিটের মোটরযাত্রা। অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে নিয়ে যান আমাদের দু'জনকে। আলাপ করিয়ে দেন তার স্ত্রীর সঙ্গে। কথাবার্তা চলে তাদের আমেরিকা পরিক্রমা নিয়ে। অধ্যাপককে একরাশ লেকচার দিতে হবে। আমাদের মুর্শিদাবাদ বদলীর প্রসঙ্গও ওঠে। তিনি মালদার সন্তান। মালদার প্রসঙ্গে কিছু বলেন। তাঁর বিরাট লাইব্রেরী ঘুরে ফিরে দেখান। তিনি বহুবিদ্যার সাগর। হেন বিষয় নেই যে বিষয়ে তার পড়াশুনা নেই। সে বিষয়ে তার লেখা নেই। প্রজ্ঞা ও প্রতিভার ছাপ মুখমণ্ডলে। উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

লাইব্রেরীতে বসে অধ্যাপকের সঙ্গে ভাববিনিময় করছি এমন সময় বেল বেজে ওঠে। অধ্যাপক উঠে যান অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে। প্রবেশ করেন আরো এক দম্পতী, তাঁরাও অপর দুই দম্পতীর মতো শ্বেত কৃষ্ণ। অধ্যাপক যখন পরিচয় করিয়ে দেন তখন কৃষ্ণ বলে ওঠেন, "আরে আপনি! আপনাকে আমি দেশে ফিরে আসার পর থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চিনতে পারছেন আমাকে? আমি প্যারিসের সেই ঘোষ। প্রাণানন্দ ঘোষ। আর ইনি আমার স্ত্রী, অস্ট্রিয়ান কাউন্টেস।

আমি তো অবাক। প্যারিসের ঘোষকে আমার বরাবর মনে ছিল, কিন্তু আঠারো বছর আগে দেশে ফিরে আসা অবধি না পেয়েছি তাঁর দেখা, না পেয়েছি তাঁর চিঠি বা সন্ধান। কেউ বলতে পারে না তিনি এখন কোথায়। দেশে না বিদেশে। আদৌ বেঁচে আছেন কি না। প্যারিসে তিনি আমার গাইড ছিলেন। লোকটি অতি নিরীহ ও নিঃস্বার্থ। গরিবের ছেলে। সামান্য টাকায় প্যারিসের ডাক্তারি পড়ার খরচ চালাতে হয়। নিজেই রাঁধেন। দুষ্ট

পুষ্ট নন, রোগা পেটকা। প্যারিসের বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে আড্ডা দেন না, দলবাজী করেন না, মেয়েদের পেছনে ছোটেন না, মদ খান না ও খাওয়ান না। পোশাক পরিচ্ছদও অতি সাধারণ।

আমি জানতুম যে প্যারিসের মেডিকাল ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরলে ওঁর চাকরি জুটবে না। প্রাইভেট প্র্যাকটিস জুটলেও জুটতে পারে। ওঁর মতো যে দু'একজন ফিরেছেন তাঁরা অগতির গতি যুদ্ধের মরসুমে আর্মি মেডিকাল কোরে যোগ দিয়ে পরে বেকার হয়েছেন। তাই ওঁর সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ ছিল। কিন্তু এ যে দেখছি দিব্যি হৃষ্ট পুষ্ট, মূল্যবান পোশাক পরিহিত, সফল সুখী পুরুশ। অষ্ট্রিয়ান কাউন্টেস লাভ তো রূপকথার রাজকন্যা লাভ।

ঘোষ সেদিন আমাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে তাঁর জীবনকাহিনী শোনান। তাঁর যতটুকু মনে আছে ততটুকু শোনাই।

ডাক্তারি পাশ করে ঘোষ প্যারিসেই থেকে যান। সেখানকার হাসপতালে কাজকর্মের অভাব ছিল না। ফরাসীরা বিদেশীদের তাড়িয়ে দেয় না। কাজের লোক হলে আপনার করে নেয়। কালো মানুষ বলে বাছবিচার করে না। প্যারিসে সেটল করাই ছিল তাঁর কল্পনা। তবে তিনি পরে একদিন দেশে ফিরে আসার আশাও ত্যাগ করেন না। তাই ব্রিটিশ সাবজেক্ট হিসাবে যে পাশপোর্ট পেয়েছিলেন সেটি রেখে দেন।

কে জানত জার্মানীতে হিটলার সর্বেসর্বা হবেন ও জোর করে অষ্ট্রিয়া দখল করবেন। অষ্ট্রিয়া থেকে নাৎসীবিরোধীরা পালিয়ে আসবেন। প্যারিসে আশ্রয় নেবেন। এমনি একটি ছিন্নমূল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে চিকিৎসা সূত্রে এই বাঙালী ডাক্তারের পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। প্রণয় থেকে পরিণয়। ফরাসীরা কেউ তাতে কোনো দোষ দেখে না। ঘোষ দম্পতী শান্তিতেই বাস করেন। তাঁদের একটি কন্যাসন্তানও হয়। সাংসারিক প্রয়োজনে ঘোষকে প্যারিসের বাইরে আর একটু অর্থকরী জীবিকার সন্ধান করতে হয়। হলাণ্ডে মিলে যায় তেমন সুযোগ। হলাণ্ডের ছোট একটি শহরে। সেখানে সাদর অভ্যর্থনা পান। তিনি কিসের যেন স্পেসিয়ালিস্ট। কিছুদিনের মধ্যে জমিয়ে বসেন।

মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে নাৎসীরা যখন যুদ্ধে নেমে হলাণ্ড অধিকার করে ও ঘোষকে ধরে নিয়ে গিয়ে কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই। তিনি ব্রিটিশ সাবজেক্ট। সুতরাং সন্দেহভাজন। কোন্ মুখে

আপত্তি করবেন? বললে শুনবে কেন? কিন্তু টরচার করতে এলে বলেন, "ব্রিটিশ সাবজেক্টের উপর টরচার ব্রিটেন ক্ষমা করবে না। চাকা যদি ঘুরে যায় আপনাদের উপরেও টরচার হবে।" তা ফল হয়। কিন্তু এর পরে যে অত্যাচারটা শুরু হয় সেটা কায়িক নয়, মানসিক। তাঁকে বলা হয় তিনি কৃষ্ণাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ নাৎসীদের শাস্ত্র অনুসারে অবৈধ। সুতরাং তিনি তাঁর তথাকথিত স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেবেন না। স্ত্রীকে আসতে দেওয়া হবে না। কন্যাকেও না। ওদিকে স্ত্রীকেও বলা হয় যে তিনি যদি ভালো চান তো তাঁর তথাকথিত স্বামীকে ডাইভোর্স করুন। নইলে তাঁকে এই শহরেই থাকতে দেওয়া হবে না। ভদ্রমহিলা বলেন, "সে কী কথা! আমার স্বামীকে আমি কোন্ অপরাধে ত্যাগ করব? তিনি শ্বেতাঙ্গ নন, এটা কি একটা অপরাধ?"

এই মানসিক অত্যাচার মাসের পর মাস চলতে থাকে। শেষে ঘোষ তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "নামকা ওয়াস্তে ডাইভোর্স করো। যুদ্ধের পরে আবার বিয়ে করা যাবে।" তিনি ডাইভোর্স করেন, কিন্তু এই শর্তে যে বাপের সঙ্গে মেয়ের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হবে না। মেয়ে নিয়ে আসবেন মেয়ের মা। কর্তারা অনুমতি দেন, কিন্তু এই শর্তে যে সাক্ষাৎকারের সময় প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে প্রাক্তন স্ত্রী কথা বলতে পারবেন না। মূকাভিনয় করতে হতো দু'জনকেই। এ ছাড়া আর কোনো যন্ত্রণা ছিল না। কালো মানুষ হলেও বন্দীটি তো ভারতীয়। ভারতীয়-দের সঙ্গে তো শত্রুতা নেই।

"যুদ্ধ একদিন শেষ হয়ে যায়। আমি মুক্তি পাই। আবার আমাদের বিয়ে হয়। একই নারীকে আমি দুইবার বিয়ে করেছি।" ঘোষ রসিকতা করেন।

হল্যাণ্ড কিন্তু তাঁদের সহ্য হয় না। তাঁরা সুইটজারলণ্ডে চলে যান। সেখানে একটা চমৎকার বাড়ী কিনে বসবাস করেন। তাঁদের বাড়ীর একাংশ হয় অতিথিশালা। অতিথিরা অবশ্য আতিথেয়তার প্রতিদান দেন। ডাক্তারি করতে দেওয়া হয় না। ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করা চলে। আপাতত তিনি এসেছেন একটি এয়ারলাইনের প্রতিনিধি হয়ে। উঠেছেন গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলে। ইতি-মধ্যেই জন্মভূমি ঘুরে এসেছেন। সেটা এখন পাকিস্তানে। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানরা তেমনি বন্ধুভাবাপন্ন। ছাড়তে চায় না। কী করা যায়! ফিরে যেতেই হবে।

এর পর ঘোষ আমাকে মস্ত বড়ো চমক দেন। বলেন, "প্যারিসে শেষবার আপনি আমাকে একটা বিদায় উপহার দেন, মনে আছে ? আপনার প্রবন্ধের বই 'তারুণ্য'। বইখানি আমি যত্ন করে তুলে রাখি। বাংলা বই তো আমার কাছে আর ছিল না। বন্দীশিবিরে যখন যাই তখন আপনার বইখানি নিয়ে যাই। আপনার 'তারুণ্য' আমাকে বাঁচাবার প্রেরণা দেয়, বাঁচিয়ে রাখে। তাই আপনাকে আমি ভুলতে পারিনে। ভুলিনি।"

কথা ছিল আবার আমাদের দেখা হবে। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম তাঁরা কলকাতায় নেই। তারপর কেটে গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ইতিমধ্যে আর দেখাও হয়নি, খবরও মেলেনি। মাঝখানের সূত্র ছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। তিনি সেদিন আমাদের বিদায় দিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। আমরা চলে যাই মুর্শিদাবাদ আর তাঁরা চলে যান আমেরিকা। কথা ছিল আবার আমাদের দেখা হবে, আলাপ আলোচনা হবে। কিন্তু আমেরিকায় বিনয়কুমার অসুস্থ হন, সে অসুখ সারে না। তিনি সেইদেশেই দেহরক্ষা করেন।

আমার জীবনের সেদিনকার সন্ধ্যাটি স্মরণীয়। মনে হয় দৈবানুগৃহীত।

রামমোহন রায় স্মরণে

রামমোহন রায় তাঁর দেশকে অতিক্রম করে বিশ্বচেতনায় উপনীত হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁর যুগকেও অতিক্রম করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছিলেন। ভারতে যাঁর জন্ম বিদেশে তাঁর মৃত্যু, কিন্তু সে বিদেশও তাঁর কাছে আপন দেশের মতো প্রিয়। সেখানেও তাঁর আত্মীয় স্বজন। সেখানে তিনি একটি কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় প্রজা নন। চিন্তাশীলদের সমকক্ষ। মানসিকতায় স্বাধীন। মধ্যযুগের আবহাওয়ায় তাঁর জন্ম, কিন্তু আধুনিক যুগের কেন্দ্রস্থলে তাঁর মৃত্যু। আধুনিকতায় তিনি প্রথম সারিতেই ছিলেন। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট, ইউরোপীয় ইতিহাসের এই তিনটি পর্যায়কেই তিনি তাঁর জীবনের অঙ্গ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের বাণীও তাঁর অন্তরে সাড়া জাগিয়েছিল। ব্রিটেনের লিবারল মতবাদের প্রবক্তাদের সঙ্গেও তিনি একাত্ম হয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে তিসি ছিলেন তাঁর স্বদেশের রাজদূত ও স্বযুগের অগ্রদূত। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক প্রতীচ্যের সেতুবন্ধন তাঁর আগে আর কেউ করেননি। সেদিক থেকে তিনি অভূতপূর্ব। তখনো পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে প্রবর্তিত হয়নি, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানও বিস্মৃতির অতলে। সেতুবন্ধন ছিল একান্ত দুরূহ।

রামমোহনের জীবনের একটি মহত্ত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু পরবর্তীকালে উপেক্ষিত। তিনি সর্বাগ্রে অধ্যয়ন করেছিলেন আরবী ফার্সী। তাঁর মতো জবরদস্ত মৌলবী মুসলমানদের মধ্যেও বিরল ছিল। তা না হলে তিনি দিল্লীর বাদশাহের খেলাত পেতেন না, 'রাজা' হতেন না। বিলেত যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করতে পারতেন না। সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারতেন না। তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকত। তাঁর জীবনী লিখতেন কোন্ মিস কলেট ও কোন্ মিস কার্পেণ্টার? আমাদের দেশের চিরকালের রীতিই এই যে ইউরোপ আমেরিকায় মর্যাদা না পেলে কেউ স্বদেশে মর্যাদা পান না। যেমন রামমোহন তেমনি বিবেকানন্দ, তেমনি রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীও বলতে পারি, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ করে বিখ্যাত না হলে ভারতেই বা তাঁকে চিনত কে?

হিন্দুর সঙ্গে মুসলিমের বিরোধ আজও মেটেনি, কবে মিটবে তা আমাদের

অজানা। কিন্তু মাদ্রাসায় গিয়ে আরবী ফার্সীভাষায় ইসলাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে তার পরে সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র নামক প্রস্থানত্রয় অধিগত করা একটি রেকর্ড। এ রেকর্ড এখনো কেউ ভঙ্গ করতে পারেননি। রামমোহনের পূর্বে দারা শিকোহ্ই বোধ হয় অগ্রণী। হয়তো আরো আগে আলবেরুনি। মুসলমানদের সঙ্গে রামমোহন এক গভীর সাযুজ্য অনুভব করতেন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের চক্ষে এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। তিনি নাকি সর্বক্ষণ যবন পরিবৃত হয়ে থাকতেন। সেই তিনিই আবার ইউরোপে গিয়ে সবক্ষণ আরেক প্রকার যবন পরিবৃত হয়ে জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন। এটাও কি তাঁর সমসাময়িক হিন্দু প্রবরদের মনে বিরাগ উদ্রেক করেনি? সতীদাহের বিরুদ্ধে, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে, এক ঈশ্বর ব্যতীত বহু দেবদেবী তথা অবতারগণের অর্চনার বিরুদ্ধে তাঁর কার্যকলাপ তাঁকে নিষ্ঠাবান হিন্দুদের কাছে যবনদের মতো অপাঙ্‌ক্তেয় করেছিল। দেশে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত না করলে তাঁকে সমাজচ্যুত হতে হতো। বিদেশে খ্রিস্টানদের গোরস্থানে সমাধিস্থ হওয়াও যবনসুলভ আচরণ।

হিন্দুধর্ম বিচারের উপরে আচারকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। আচারের মরুবালি রাশি বিচারের ক্ষীণ স্রোতকে গ্রাস করে ফেলেছিল। তাই রামমোহনকে তাঁর স্বধর্মীরা সেদিন বুঝতে পারেনি। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা যদি প্রাচীনকালের মতো উদার হতো তা হলে তিনিই ছিলেন প্রকৃত হিন্দু। সব দেশই যার দেশ, সব মানুষই যার আত্মীয়, সব ধর্মই যার কাছে সত্য, যার চিন্তপ্রণালী বৈজ্ঞানিক। যার ঈশ্বর মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় আবদ্ধ নন। তেমন হিন্দুকে মানবিকবাদীও বলা যায়। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে, কূপমণ্ডূক হয়ে, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোহাওয়া রোধ করে যারা অচলায়তনে বাস করত তারা যদি নিজেদের দুর্বল না করত তবে মুষ্টিমেয় তুর্ক বা মোগল বা ইংরেজ এদেশ জয় করতে পারত না। রামমোহন পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বসাধক। মনের মুক্তি না হলে মানুষ কখনো স্বাধীন হয় না। রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ মনের মুক্তি সাধন করে দেশকে পরোক্ষভাবে প্রস্তুত করেন। সেই প্রস্তুতি বাংলাদেশেই সর্বাধিক হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের তৎকালীন প্রধান পুরুষ রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহন যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পাঁচখানি পত্র ও তাঁর পুত্রকে লিখিত একখানি পত্র সংগ্রহ করে ডক্টর দিলীপকুমার বিশ্বাস

তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'রামমোহন সমীক্ষা' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তার থেকে বোঝা যায় নীতিগতভাবে সমাজতন্ত্রবাদে তাঁর সমর্থন ছিল, কিন্তু খ্রীস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি ধর্মের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রাখা অত্যাবশ্যক। প্রেম, করুণা ইত্যাদি চিরবৃত্তিগুলি যেন ক্ষুন্ন না হয়। আমার মনে হয় রামমোহন ওয়েনকে ঠিক বুঝতে পারেন নি। ওয়েন ছিলেন প্রাইভেট প্রপার্টির বিরোধী। সমাজতন্ত্রবাদ প্রাইভেট প্রপার্টির সঙ্গে বেখাপ। আদি খ্রীস্টানরাও প্রাইভেট প্রপার্টিতে বিশ্বাস করতেন না। অনেকেই প্রাইভেট প্রপার্টি ত্যাগ করে কমিউন বা আশ্রম স্থাপন করে সেখানে গিয়ে কায়িক পরিশ্রম করতেন। পরে দেখা গেল চার্চ বা সঙ্ঘের হাতে বিপুল সম্পত্তি এসেছে। চার্চও এক বিরাট জমিদার ও মহাজন। ফলে ওয়েন প্রমুখ সংস্কারপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী ধর্মবিমুখ বা ঈশ্বরবিমুখ হন। যাঁরা প্রাইভেট প্রপার্টিতে বিশ্বাস করতেন তাঁরা স্বভাবতই ওয়েন প্রচারিত সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহুসংখ্যক লিবারল। কেউ কেউ নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী। তাঁদের কাছে সমাজতন্ত্রবাদীরা কালাপাহাড়, কারণ তাঁরা প্রাইভেট প্রপার্টিকে বিনাশ করে সমাজের ভিত্তি ধ্বংস করতে চান। ওয়েনের মতো মোলায়েম রিফর্মিস্টকে নিয়ে এই! পরে যখন মার্কসের মতো চরম রেভোলিউশনারি আসেন তখন তো দু' পক্ষেই যুদ্ধং দেহি মনোভাব প্রকট হয়। ওয়েন শ্রেণীসংগ্রাম প্রচার করেননি। মার্কস সেইটেই করেন। আজকের ইউরোপেও এর নিষ্পত্তি হয়নি। আদি খ্রীস্টান ও আধুনিক কম্যুনিস্ট উভয়েই প্রাইভেট প্রপার্টিব বিপক্ষে। স্বপক্ষে যাঁরা তাঁদের মধ্যেও নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী আছেন। রামমোহন ঠিক ধরতে পারেননি যে বিবাদটা ধর্মবিশ্বাস ঘটিত নয়, সম্পত্তির মালিকানা ঘটিত। বিলেতে যাঁদের দ্বারা তিনি পরিবৃত ছিলেন তাঁরা লিবারল, ডেমোক্রাট, রামমোহনও তাঁদের একজন। ওয়েনকে তাঁরা এড়াতেন বা ডরাতেন। রামমোহন তাই ওয়েনের সভায় যাননি। মতান্তরটা এইজন্যে নয় যে রামমোহন ছিলেন গভীরভাবে ধার্মিক আর ওয়েন অধার্মিক। প্রত্যুত ওয়েনও ছিলেন আদি খ্রীস্টানদের মতো গরিব মজুরদের দরদী বন্ধু। উভয়ের প্রয়াণের একশো বছরের মধ্যে লেনিন এসে রুশদেশে প্রাইভেট প্রপার্টি লোপ করেন।

শরৎচন্দ্রের অশেষ প্রশ্ন

সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত তাঁর জন্মস্থান দেবানন্দপুরে আমন্ত্রিত হয়েছিলুম। তিনি তাঁর স্বগ্রামকে সাহিত্যে অমর করে দিয়ে গেছেন। সেখানে গেলেই মনে পড়ে যায় 'পণ্ডিত মশাই' ও 'পল্লীসমাজে'র কথা। সেই সঙ্গে 'শ্রীকান্তে'র। রাজলক্ষ্মী তো সেইখানকার মেয়ে। দেবানন্দপুর এখন একটি তীর্থ। তবে মাত্র দুই ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে তার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হয় না।

প্রধান অতিথি হিসাবে আমার কাজ ছিল কিছু বলা। আমার বক্তৃতা ছিল সংক্ষিপ্ত। তা না হলে নাট্যাভিনয়ের দেরি হয়ে যেত। যার জন্যে জনতা উদ্‌গ্রীব। আমার মুখ থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নতুন কথা কীই বা ওঁরা শুনতেন? আর আমিই সেই একই কথা ক'বার ক'জায়গায় শোনাব?

সভাশেষে সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে চায়ের আসরে যাই। তিনি অনুযোগ করেন যে আমার কাছে ওঁরা আরো কিছু শুনবেন আশা করেছিলেন। আমি বলি "শরৎসাহিত্যের key question বা key problem তো হলো পতিতা নারীর ভাগ্য। তার আলোচনার উপযুক্ত স্থান বা কাল এটা নয়। গ্রামের লোকও নয় তার উপযুক্ত পাত্র।"

উপযুক্ত স্থান কাল পাত্র পেলে এ বিষয়ে আলোচনা করা কর্তব্য। বাংলা-সাহিত্যে, কেবল বাংলাসাহিত্য কেন ভারতীয় সাহিত্যে, পতিতা নারীর প্রবক্তা শরৎচন্দ্রের মতো আর কে আছেন? পতিতা বলে যারা সমাজের বাইরে ইম্‌মরাল বলে তারা সাহিত্যেরও বাইরে। তাদের কাহিনী পড়লে পাঠকপাঠিকার চরিত্র নষ্ট হবে। যদি বা কেউ তাদের নাটকে বা উপন্যাসে আনেন তবে এমন ভাবে আনবেন যাতে তাদের সম্বন্ধে ঘৃণা বা বিরাগ জন্মায়। পুঁথিগত হলেও "বিষাক্ত তার সঙ্গ"। দেবী হবার অধিকার তাদের নেই, যেহেতু তারা নাচে গানে অপ্‌সরা। নারী হবার অধিকারও তাদের নেই, যেহেতু নারীর ধর্ম সতীত্ব। তারা তা হলে কী? তারা দানবী। অথচ মানবের সঙ্গেই তাদের প্রতিরাত্রের কারবার। এরা কিন্তু সেই কারণে দানব নয়। দিনের বেলা এদের অন্য রূপ। আমার এক পুলিশ অফিসার বন্ধু অনুসন্ধানের জন্যে গণিকালয়ে যান। সেখানে গিয়ে যেসব পুরুষের মুখ দেখেন তাদের কেউ বা অধ্যাপক, কেউ বা পুরোহিত, কেউ বা

হাকিম, কেউ বা উকীল, কেউ বা সম্পাদক।

এটা নতুন কিছু নয়। প্রাচীন ভারতেও এইরকম ছিল। মধ্যযুগের ভারতেও। তাই বেশ্যালয়ের মাটি পবিত্র। পূজার সময় সে মাটি কাজে লাগে। বেশ্যারা অপবিত্র হলেও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা পবিত্র হতে পারেন। এ ধারণা আধুনিক যুগেই ঘা খায়। একালে তাই সেকালের মতো প্রকাশ্যে যাতায়ত করা চলে না, তবে কলকাতার বাবুমহলে শতখানেক বছর আগেও চলত। উত্তরভারতের তো কথাই নেই। দৃশ্যত গানবাজনার জন্যেই ভদ্ররা যাতায়াত করতেন। ভদ্রাদের কাছে তো গানবাজনা আশা করা যেত না।

শরৎচন্দ্রের ছিল গানবাজনার শখ। নিজেও তিনি গান করতেন। জমিদার বন্ধুদের আশ্রয়ে থেকে তাঁকেও বাঈজীদের সান্নিধ্য পেতে হয়। তখন থেকেই এই প্রশ্নটি তাঁর জীবনের তথা সাহিত্যের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। এটিকে বাদ দিলে শরৎ সাহিত্য তার লবণত্ব হারায়। আলুনী লাগে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী এই দুই নায়ক নায়িকা মিলনপিয়াসী অথচ মিলনবিমুখ, কারণ সমাজ এদের মিলন স্বীকার করবে না। কেন? রাজলক্ষ্মীর অপরাধটা কী? নিজের দোষে নয়, ভাগ্যদোষে তাকে বাঈজী হতে হয়। তা বলে কি তার উদ্ধার নেই?

টলস্টয়ের 'রেজারেকশন' উপন্যাসটিরও অন্তর্নিহিত প্রশ্ন, বাধ্য হয়ে যে ভ্রষ্টা হয়েছে তার কি এ জীবনে উদ্ধার নেই? পতনের পর কি তার পুনরুত্থান নেই? এ প্রশ্ন যাঁদের পীড়িত করেছে তাঁরা আইন পাশ করে নারীর বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করেছেন, বেশ্যাদের জন্যে উদ্ধারাশ্রম স্থাপন করেছেন, শিক্ষা দিয়ে সাধু জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও দেখা গেল একবার যে অসতী হয়েছে চিরদিন সে অসতী বলে চিহ্নিত রয়ে গেছে, তার কপালে দাগা হয়ে গেছে 'অ' অক্ষর। কেউ তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে না, বিয়ে করবে না, সমাজে বার করবে না, সামাজিক মানুষ বলে গণ্য করবে না। আশ্রমবাসিনী হয়েও কি তার সমাজ বা পরিবার আছে? সেখানে যারা বাস করে তারা তারই মতো হতভাগিনী। ধর্মীয় কারণে যারা আশ্রমবাসিনী হয় কিংবা রাজনৈতিক কারণে, তারা বাস করে ভিন্ন আশ্রমে। একের আশ্রমে অপরের স্থান নেই। কেন? এরা কি নারী নয়? মানবী নয়? এরা কি অতীতের বৃত্তি বা প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে শুদ্ধ হয়নি, সচ্চরিত্র হয়নি? এদের কি বিশ্বাস করা যায় না? এদের যদি কোনো রকমে বিয়ে দেওয়া যায় তা হলে কি

এরা স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হবে ? সমাজের কলঙ্ক হবে ?

শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' তরুণ বয়সে আমার হাতে পড়ে। আমি তার একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখি। সমালোচনা তো নয়, প্রশস্তি। 'ভারতী' সেটি প্রকাশ করে। শরৎচন্দ্রকে কে নাকি বলেছিল যে বেশ্যা যারা হয় তাদের অধিকাংশই বিধবা। কিন্তু তাঁর এক বন্ধু নাকি অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন যে অধিকাংশ স্থলে ওরা সধবা। স্বামীর অত্যাচার বা স্বামীগৃহের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কুলত্যাগ করেছে। এই পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য কি না আমি জানতুম না, শরৎচন্দ্রের কথাই আমি মেনে নিয়েছিলুম। পরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর উপন্যাস 'দুই রাত্রি' পড়ে আমার জ্ঞান হয় যে, আমাদের দেশের বেশ্যাদের নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকেরই আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দেওয়া। যেমন করে পারে তারা একটি পুরুষকে এতে রাজী করায়। বিবাহের পর স্বামীটি হয় পলাতক বা পরিত্যক্ত বা গলগ্রহ। কিন্তু স্ত্রীটি হয় সধবা। তার সিঁথিতে সিঁদুর ওঠে। এইসব সধবাও শরৎচন্দ্রের বন্ধুর পরিসংখ্যানের অন্তর্গত হয়ে থাকতে পারে। সম্ভবত তিনি নিজেই জানতেন না যে এ রকম একটা প্রথা আছে। আমি যতদূর জানি, আছে। জিজ্ঞাসা করলে যারা সধবা বলে পরিচয় দেয় তাদের পুনর্বাসনের উপায় কি বিবাহবিচ্ছেদ না ঘটিয়েই পুনর্বিবাহ ? সে এক জটিল ব্যাপার হবে। বিধবার বিয়ে যত না কঠিন তার চেয়েও কঠিন পতিপরিত্যক্তার বা পতিপরিত্যাগিনীর পুনর্বিবাহ।

টলস্টয়ের উপন্যাসের নায়িকা কাতুশার পুনর্বাসন ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ বেশ্যা হওয়ার আগে তার বিয়ে হয়নি। ভ্রষ্টা হলেও সে কুমারী। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের হতভাগিনীরা বিধবা না হয়ে থাকলে সধবা। তাই অচলাকে নিয়ে অচল অবস্থা। মহিম তাকে আশ্রয় না দিলে সে যা হতো তা বর্ণনা করতেও ভয় করে। হয়তো কিরণময়ীর মতো পাগল। বিধবা সাবিত্রীর বা বিধবা রাজলক্ষ্মীর বিবাহ তিনি দেননি, বিধবাবিবাহে তিনি বিশ্বাসই করতেন না, তাঁর সতী বিধবা নায়িকাদেরও তিনি অবিবাহিত নায়কদের হাতে সম্প্রদান করেননি। সম্ভবত তাঁর মনে এই বদ্ধমূল সংস্কার ছিল যে আবার বিয়ে করলে নারীর সতীত্ব নষ্ট হয়। তার চেয়ে তাকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। যেন কাশীতে যারা যায় তাদের সকলের সতীত্ব অটুট থাকে। স্থানমাহাত্ম্যে বোধ হয়। তেমনি আর একটি স্থান হলো পুরী। এই ধরনের সরল সমাধান সেন্টিমেন্টাল

নভেলেই মানায়।

বিধবারা প্রেমে পড়বে, সধবারা প্রেমে পড়বে, পতিতারা প্রেমে পড়বে, তা না হলে পাঠকপাঠিকারা নভেল পড়বে না। অথচ শেষপর্যন্ত দেখা যাবে ওদের সকলের জন্য ঢালা ব্যবস্থাপত্র— ব্রহ্মচর্য। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি। এতে নারীর কী আনন্দ তা নারীই জানে, কিন্তু পুরুষ যদি তার প্রেমে পড়ে থাকে সে বেচারাকেও আজীবন ব্রহ্মচারী হতে হবে। আনন্দের সঙ্গে নয় নিশ্চয়।

আমার এক বন্ধু শরৎচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। শরৎচন্দ্র নাকি উত্তরে বলেছিলেন যে রাজলক্ষ্মী তাঁর জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। পুরুষ চায় সমাজ, পুরুষ চায় সংসার, পুরুষ চায় সন্তান, পুরুষ চায় সম্মান। এই চারটির একটিও রাজলক্ষ্মী তাঁকে দেয়নি। তাই যদি হয়ে থাকে তবে পুরুষেব মুক্তি বৈরাগ্য সাধনে নয়, পুরুষের সিদ্ধি ব্রহ্মচর্যে নয়। পুরুষ তা হলে করবে কী ? যাকে ভালবাসে সে যদি বিধবা হয়ে থাকে বা সধবা হয়ে থাকে বা পতিতা হয়ে থাকে তবে তাকে বর্জন করে অন্য নারীকে বিবাহ করবে। এই গতানুগতিক পন্থাই পুরুষকে দেবে চতুর্বর্গ ফল। সমাজ আর সংসার আর সন্তান আর সম্মান।

আর প্রেম ? না, প্রেম নয়। প্রেম শুধু নাটক নভেলের জন্যে। যদি কেউ তাকে জীবনেও চায় তবে হিসাব করে কুমারীর প্রেমে পড়তে হবে। তেমন প্রেমের পরিণতি হবে বিবাহে। ব্রহ্মচর্যে নয়। প্রেমের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের জোড় মেলানো শক্ত। তবে তারও নজীর আছে কারো কারো জীবনে। যেমন বার্নার্ড শ'র। যেমন ভার্জিনিয়া উলফের। উভয় ক্ষেত্রেই নারীর ইচ্ছায়। কেন, সে অনেক কথা। কারো কারো বেলা পুরুষের ইচ্ছায়।

টলস্টয়ের 'রেজারেকশন' শরৎচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু টলস্টয় তাঁর কাতুশার বিবাহের পথ খোলা রাখেন এক বিপ্লবীর সঙ্গে। প্রেম থেকেই বিবাহ। কিন্তু সেক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, প্রেম কামগন্ধহীন। তবে বিবাহের পর স্বাভাবিক হবে, এর আভাস আছে বিপ্লবীর ভাবনায়। শরৎচন্দ্র টলস্টয়ের মতোই দরদী। কিন্তু তেমনি সংস্কারমুক্ত বলে মনে হয় না। তাঁর মানস আধুনিক মানুষের মতো, তাঁর হৃদয় আধুনিক মানুষের মতো, কিন্তু তাঁর সংস্কার সনাতনীদের মতো। পতিহীনা, পতিপরিত্যক্তা, পতিপরিত্যাগিনী নারীর এক মাত্র গতি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যদি সে পতিতার জীবন না চায়। সেকালের কুলীন কুমারীর জন্যেও ছিল সেই ব্যবস্থাপত্র। সারাজীবন। যদি বিবাহ না হয়।

মনে পড়ে

হিন্দুসমাজের বাইরে যেসব সমাজ তাদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান একান্ত স্বল্প। এক ব্রাহ্মসমাজকে আমি চিনি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আর হিন্দুসমাজের বাইরে বলা ঠিক হবে কি ? আগেকার দিনে জগন্নাথ মন্দিরের সদর দুয়ারে লেখা থাকত ব্রাহ্মদের প্রবেশ নিষেধ। এখনও আছে কিনা বলতে পারব না। দীর্ঘকাল যাইনি। যাবও না, যদি না ওরা আমার স্ত্রীকেও যেতে দেয়।

ভারতীয় খ্রীস্টীয় সমাজের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়, অথচ ব্রাহ্মসমাজের পরে খ্রীস্টীয় সমাজেই আমি যেটুকু মিশতে পারি মিশেছি। বেশীর ভাগ ইউরোপে। তাছাড়া আমেরিকা তো আমার ঘরেই।

যেখানে আমার জন্ম সেখানে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর অন্যতম ছিলেন এক খ্রীস্টান ভদ্রলোক। জন চৌধুরী তাঁর নাম। তাঁর বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেছি। ললিত নামটি এখনও মনে আছে। দেখতেও সে ছিল ললিত। আমার বোন যে বিদ্যালয়ে পড়ত তার প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মিসেস মহাপাত্র। তাঁর স্বামী স্যামুয়েলবাবু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। স্যামুয়েল-বাবুর ভাই লিমুয়েলবাবু ছিলেন কাকাদের বন্ধু। তাঁর চেহারা আরো পরিষ্কার মনে আছে। বেজায় হাসিখুশি মানুষটি। ছেলেবেলায় আমার সেজকাকা আমাকে যীশুখ্রীস্ট উপহার দেন। বাংলা বই। যীশুকে তখন থেকেই আপনার বলে জানি। পরে ছোটকাকা আমাকে নিয়ে যান এক গির্জায়। সেখানে আমি হাঁটু গেড়েছি, চোখও বুজেছি। উপদেশও শুনেছি। রুটি ও মদ (বা মদের পরিবর্তে জল যেটাই হোক) আস্বাদন করেছি। ওটা ছিল ব্যাপটিস্টদের গির্জা। ঘটনাটা পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বেকার। তখন কী প্রথা ছিল মনে নেই।

গির্জায় যাওয়াটা যে উপলক্ষে সেটা হলো নিখিল ভারতীয় খ্রীস্টীয় সম্মেলন। বহু খ্রীস্টান প্রধানকে চাক্ষুষ করি। উৎকলের মিঃ মধুসূদন দাস তো ছিলেনই, ছিলেন দক্ষিণ ভারতের মিঃ দেবদাস ও মিঃ কে টি পল ও ভাগলপুরের রেভারেণ্ড তরফদার। ওঁদের ভাষণ শুনেছি। মধুসূদন দাস সগর্বে বলেন, "I am every inch an Indian."

বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ছিল আমাদের বংশগত। বাড়ীতে যাঁরা আসতেন

তাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। আলাপ করতেন বাবার সঙ্গে। মাঝে মাঝে এক আধটা উক্তি আমারও কানে আসত। সে বয়সে নানামতের তুলনামূলক বিচার আমার সাধ্যে কুলোত না। এখনো কি কুলোয়? বুঝতে পারলে তো বিচার করব?

প্রত্যেক ধর্মে এমন কিছু আছে যা অন্য কোনো ধর্মে নেই। সেই নিজস্ব সম্পদ আছে বলেই সে আছে ও থাকবে। এখানে সংখ্যার প্রশ্ন অবান্তর। সমাজের প্রশ্নও গৌণ। যারা খ্রীস্টীয় সমাজভুক্ত নয় তারাও যীশুর মহিমা স্বীকার করে ও তাঁর বাণীর থেকে প্রেরণা পায়। তিনি ও তাঁর বাণী বিশ্বমানবের গৌরব।

বাইবেল আমাদের বাড়ীতে আসে আমার বাল্যবয়সে। আমার ছোটকাকা একবার আই-এ পাশ করে বাইবেল সোসাইটি থেকে উপহার পান। আরেকবার বি-এ পাশ করে। তখন আমার ইংরেজী বিদ্যা অতি সামান্য।

তবু সার্মন অন্ দ্য মাউণ্ট পড়ি। অন্তর স্পর্শ করে। যেটুকু পারি গ্রহণ করি। একদিন আমার গৃহশিক্ষকের হাতে অক্সফোর্ড মিশনের 'এপিফ্যানী' দেখি। মাত্র চার আনা চাঁদায় সারাবছর সপ্তাহে সপ্তাহে পাওয়া যায়। ডাকঘরের লোক জানবে যে আমার নামেও পত্রিকা আসে। পাড়ার ছেলেরা দেখবে যে আমার নামও গ্রাহকতালিকায় ছাপা হয়। এমনি করে তো গ্রাহক হয়ে পড়া গেল। তারপর দেখা গেল প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে আমার নাম। অতি নির্বোধ প্রশ্ন। সম্পাদক তারও উত্তর দিয়েছেন। তার ফলে আমি আরো উদ্ধত হয়ে উঠি। কী একটা তর্ক তুলি, ও প্রতিপক্ষকে বলি "ফুলস অফ দা ফার্স্ট ওয়াটার"। ইংরেজি ইডিয়মের বই থেকে যা শিখেছি তার প্রয়োগ করি ইংরেজেরই উপরে। সম্পাদক বোধহয় আমার লেখা পড়ে ঠাওরান আমি একজন শিক্ষিত যুবক। সম্পাদকীয় লেখেন আমার চিঠির জবাব দিতে। "মিঃ রায় নিজেই নিজেকে পুওর কমপ্লিমেণ্ট দিয়েছেন।" পড়ে আমার তো লজ্জায় মাথা হেঁট। বয়স তখন তের কি চৌদ্দ। ও বয়সে আমি বেশ গোঁড়া হিন্দু ছিলুম। কিন্তু কী জানি কেমন করে আমার ভিতরে একটা পরিবর্তন আসে। আমি ব্রাহ্মদের ও খ্রীস্টানদের প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠি। কলেজে গিয়ে ওটা বেড়ে যায়। আই-এ পরীক্ষার সময় আমাকে যে ফর্ম পূরণ করতে হয় তাতে ধর্মের ঘরে লিখি "Monotheistic Eclectic Hinduism" অর্থাৎ "একেশ্বরবাদী সর্বধর্মের সারসংগ্রহকারী হিন্দুত্ব।" বন্ধুরা তা নিয়ে হাসাহাসি করেন। কিন্তু সংক্ষেপে ওই আমার ধর্মমতের পরিচয়।

খ্রীস্টধর্মের থেকেই আমি সংগ্রহ করেছি বেশি। যীশুর বাণী তো আমি প্রত্যহ স্মরণ করি। "ভগবানের রাজ্যের ও তাঁর ন্যায়নিষ্ঠার সন্ধান কর। আর সব আপনা হতেই জুটে যাবে।" শত্রুকেও ভালোবাসতে হবে, এইখানেই যীশুর শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব। প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসতে পারা কি কম কঠিন?

প্রেরণার উৎস

তখন অসহযোগের যুগ। গান্ধীজীর লেখা প্রত্যেক সপ্তাহে পড়তুম। খদ্দর সব সময়েই গায়ে দিতুম। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমি গান্ধীজীর সব কথা মেনে নিতে পারিনি। ইউরোপে যাবার তীব্র বাসনা ছিল। সে বাসনা পূর্ণ হত না যদি না আমি আই. সি. এস. প্রতিযেগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করে নির্বাচিত হতুম। বিলাতে দু' বছর থাকি। সেই তখন থেকেই আমার চিন্তা কবে আমি চাকরি থেকে অকালে বিদায় নেব ও সাংবাদিকতাকেই আমার জীবিকা করব। ইতিমধ্যে আমি মনঃস্থির করি কেবল বাংলা ভাষাতেই কবিতা ও উপন্যাস ইত্যাদি লিখব, নয়তো ওড়িয়া, বাংলা, ইংরেজ তিনটে ভাষায় কৃতিত্ব অর্জন করা সহজ নয়।

যেমন তেমন সাহিত্যিক হতে আমি চাইনি। আর্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছি শান্তিনিকেতনে গিয়ে। তিনি বলেছেন তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে। আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উপস্থিত থাকতে, কিন্তু আমি যেতে পারিনি। পরে পত্রিকায় তার বিবরণ পড়েছি। তাতে আমার জিজ্ঞাসার নিরসন হয়নি। কেননা টলস্টয় আমার মনে আর্ট সম্বন্ধে অন্যরকম ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। মূলত আমার প্রেরণার উৎস আর্ট ও প্রেম। বিলেতযাত্রী হবার সময় 'বিচিত্রা'র জন্যে ধারাবাহিকভাবে 'পথে প্রবাসে' লিখতে আরম্ভ করি। তাতে সুইটজারল্যাণ্ডে রম্যা রলাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। সেখানেও আর্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে।

আমার লেখার ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন করেন, আমার রচনাশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর যে ছাপ আছে তা আমি সচেতনভাবে নিয়েছি কিনা। উত্তরে বলি, গোড়ার দিকে নিয়েছি। পরে আমি বুঝতে পারি যে আমার ব্যক্তিগত অভি-জ্ঞতা প্রমথ চৌধুরী মশাইয়ের অভিজ্ঞতার থেকে এক বেশী ভিন্ন যে আমাকে নিজের রাস্তাই তৈরি করে নিতে হবে। আমার রচনা প্রধানত রোমাণ্টিক ও আইডিয়ালিষ্টিক। তবে আমিও কালক্রমে একজন ইণ্টেলেকচুয়াল হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার সমভাব বহু পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু আমি আরও বেশী পরিমাণে জনগণের দিকে গেছি। সেটা টলস্টয় ও গান্ধীজীর প্রভাবে। সবচেয়ে বড় কথা

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার রেনেসাঁসের যে ঐতিহ্য প্রবাহিত তাতে তিনিও আছেন— আমিও আছি।

আমার কাছে দেশ যেমন সত্য, যুগও তেমনি সত্য। সুতরাং দেশের মাটি যেমন সত্য, যুগের আলো হাওয়াও তেমনি সত্য। গাছ যদি আলো না পায়, যদি মাটিতেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে সে গাছে ফুল ধরে না, ফল ধরে না। যুগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে আধুনিক সাহিত্য হতে পারে না। কেউ কোনদিন তাকে রেনেসাঁসের সাহিত্য বলবে না। আমাদের চিত্রকররা, ভাস্কররা সকলেই যুগের সঙ্গে পা রেখে চলেছেন। সুতরাং আমি যদি আর্টিস্ট হয়ে থাকি তবে একক নই। তাছাড়া আমি কি শুধু আর্টিস্ট ? আমি একজন ইন্টেলেকচুয়াল। একজন ইন্টেলেকচুয়ালের কাছে সারা মানবজাতিটাই আত্মীয়। সংস্কৃত শ্লোকেই বলা হয়েছে— ইনি আপন, উনি পর এ গণনা লঘুচেতাদের গণনা। যাঁরা উদারচরিত সমগ্র বসুধাই তাঁর কুটুম্ব।

কাজেই আমি যদি সর্বমানবের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র মাটির মানুষের উপরেই নিবদ্ধ করি তবে সেটা আমার পক্ষে উদারতার পরিচয় হয় না। তাছাড়া আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখাও একজন ইন্টেলেকচুয়ালের কর্তব্য। অধিকন্তু বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতি সম্বন্ধে সজাগ না হলে একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বদেশেরই বা কতটুকু সেবা করতে পারব ? যুদ্ধ ও শান্তির মত ভয়ঙ্কর গুরুতর বিষয়ে যে উদাসীন বা অজ্ঞ সে কাকেই বা কি নেতৃত্ব দেবে বা দিতে পারবে ? আমাদের কাউকে না কাউকে ইন্টেলেকচুয়াল লীডারশিপ দিতে হবে, শুধু পলিটিকাল লীডারশিপ নয়, নইলে যা হবে তা অন্ধের দ্বারা নীয়মান যথা অন্ধ।

কমলী নেহি ছোড়তী

এক যে ছিলেন সাধু, তাঁর গায়ে ছিল এক কম্বল। বারো মাস সেটা তিনি গায়ে জড়িয়ে রাখতেন, কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা, কী বসন্ত। যে দেখত সে-ই বলত, সাধুজী, এ কী ব্যাপার? আমরা এমনিতেই ঘামে ভিজছি আর আপনার গায়ে কম্বল। আপনার কষ্ট হচ্ছে না?

সাধুজী হেসে বলেন, "আরে ভাই, কষ্ট সইব না তো সংসার ছেড়েছি কেন? কিন্তু সংসার ছাড়লে কী হবে, এই কমলীকে ছাড়তে পারছি নে। আমি ছাড়তে চাইলেও কমলী আমাকে ছাড়ছে না।

হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু অমন হাস্যকর ব্যাপার ওই একটি নয়। অবিকল এক না হলেও দৃষ্টান্ত অনেক। কারো বেলা ছড়ি, কারো বেলা ছাতা, কারো কারো বেলা ওভারকোট। সাধুদের কারো কারো বেলা কান ঢাকা টুপী।

আমার বেলা চা আর খবরের কাগজ।

রোজ বিকেল বেলা আমার ঠাকুরদা বসতেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। একে একে জুটতেন তাঁর সমবয়সী প্রতিবেশী চা-সেবীগণ। কারো কারো হাতে নিজস্ব পেয়ালা বা গেলাস। চায়ের সঙ্গে বেশী করে দুধ মিশিয়ে তিনি আমাদেরও দিতেন, আমাকে আর আমার ছোট ভাইকে। আমাদের দুধ খাওয়াবার ওটাও একটা কৌশল।

বাড়ীতে দু'খানা পত্রিকা আসত। বাংলা 'বসুমতী' ও ইংরেজী 'দ্য বেঙ্গলী'। প্রথমে সাপ্তাহিক সংস্করণ, পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক। বুঝতে পারিনে, পড়তে চাইনে, কিন্তু উৎসাহ দেন আমার বাবা। ইংরেজী শেখার ওটাও একটা কৌশল। স্কুলে আর কতটুকু শেখায়?

কাকাদের একজন একটা ওড়িয়া সাপ্তাহিক পত্রিকাও নিতেন ও তাতে লিখতেন। সেটাও আমি পড়তুম। একদিন দেখি তাতে ছাপা হয়ে গেছে বাড়ীর বেড়ালের নাম। রসিকা কিন্তু স্ত্রী নয়, পুরুষ। ওকে আমার বেশ মনে আছে। ওর সন্তান সন্ততির ধারা অনেক দিন প্রবাহিত ছিল।

চা আর খবরের কাগজ যে আমাকে সারা জীবন তাড়া করবে তা কি তখন জানতুম? ছাড়তে চাইলেও ছাড়ে না। কয়েকবার ছেড়ে দেখেছি। অভ্যাস ছাড়া

অত সহজ নয়। অভ্যাস এমন নেশায় দাঁড়িয়েছে।

আগে বলি চা পানের বৃত্তান্ত। জাপানে টী সেরিমনি প্রত্যক্ষ করেছি। সে এক এলাহি কাণ্ড। তিন ঘণ্টা ধরে চলার কথা। আমরা বিদেশী অতিথি বলে সংক্ষেপিত হয়। যত দূর মনে পড়ে ঘণ্টা খানেক লাগে। মহিলারা পরিবেশন করেন। একজন পুরুষ অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে। ওটা ধর্মের অঙ্গ। বৌদ্ধ ধর্মের জেন বা ধ্যান সম্প্রদায়ের। বোধ হয় অন্যান্য সম্প্রদায়েরও।

চা আমাদের দেশে অর্বাচীন। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই। তবে সাধু সন্ন্যাসীরাও চা পান করতে ও করাতে ভালোবাসেন। পিতলের না কাঁসার বাটিতে এক বাটি গরম চা পান করেছিলুম লছমনঝোলার ছোট একটি মঠে। গঙ্গার ধারে বসে সেই চা পান করতে কত যে ভালো লেগেছিল। পান করালেন যিনি তিনি এক বর্ষীয়সী সন্ন্যাসিনী। আপ্যায়নটা বোধ হয় আমার সহধর্মিণীর সুবাদে। আমি তো একটা প্রতিজ্ঞাই করে ফেলি যে আবার আমরা লছমন ঝোলায় আসব ও থাকব। উদ্দেশ্য গঙ্গার শোভা দর্শন ও চা পান। ষাট বছর কেটে গেছে, এখনো তার পূরণ হয়নি।

নিজের বাড়ীর প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ঠাকুরদার পরলোকের পরেও চায়ের বৈঠক অব্যাহত থাকে। পৌরোহিত্য করেন বাবা। প্রতিবেশীরা আসেন না। কিন্তু বাড়ীতে অতিথি থাকলে তাঁরা যোগ দেন। চলছিল বেশ, কিন্তু হঠাৎ ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধে যায়। সংসারযাত্রার খরচ বাড়ে, কিন্তু চাকরির মাইনে সেই অনুপাতে বাড়ে না। আয় ব্যয়ের সমতা আনতে না পেরে বাবা চায়ের জন্যে খরচটা ছাঁটাই করেন। বলেন, "এখন থেকে চা বন্ধ। ওতে ট্যানিক অ্যাসিড আছে। সেটা বিষ। তাছাড়া ওটা চা-কুলির রক্ত।"

এতকালের অভ্যাস ছাড়তে আমাদের খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু ওটাও তো একরকম নেশা। নেশা জিনিসটা কি ভালো? আমার ছোট কাকা বলেন, "আমাদের মতো লোকের পক্ষে একটা নেশাই যথেষ্ট। তারই খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছিনে। তার নাম ভাত। তার উপরে আরো একটা নেশা?"

দু'দিনের বাসি পান্তা ভাতের আমানি খেলে একটু নেশার মতো ভাব আসে বইকি। আমার জন্মস্থানে ওটাও একটা ডেলিকেসি। ওর সঙ্গে একটু নুন লঙ্কা মিশিয়ে নিতে হয়। আরো কী কী মেশায়, মনে পড়ছে না। আমরা ওর তেমন পক্ষপাতী ছিলুম না। লোকে শুনলে ভাববে কী? আমরা যে "বাবু"

বলে সম্মানিত।

যুদ্ধের ধাক্কায় কাপড়েও টান পড়ে। হেড মাস্টার মশায় স্কুলের ছাত্রদের ডেকে বলেন, "তোমরা শার্ট, কোট বর্জন করো। শাল বা চাদরের দরকার কী? ধুতীর কোঁচা গায়ে জড়িয়ে আসবে। মাস্টার মশায়েরা কেউ কিছু মনে করবেন না। কেবল ইন্‌স্পেক্‌টর সাহেব যেদিন আসবেন সেদিনের কথা আলাদা।"

ওদিকে চায়ের কী হলো বলি। এক দূর সম্পর্কের পিসেমশায় আমাদের ওখানে চাকরির খোঁজে এসে আস্তানা গেড়ে বসেছিলেন। তিনিই নেন রোজ বাজার করার ভার। ঠাকুরকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। রান্নার ভার নিয়েছিলেন মা। বিকেলে কাছারি থেকে ফিরে বাবা যখন জলখাবার খেতে বসতেন তাঁর সঙ্গে আমরাও বসতুম। তখন তিনি বলতেন, "আহা! জলের বদলে এক পেয়ালা চা যদি থাকত?"

তখন মহেন্দ্র পিসে বলতেন, "আছে। টিনটাতে কয়েকটা পাতা পড়ে আছে। চাও তো এনে দিতে পারি।"

সকলে তাঁর তারিফ করত। ভাঁড়ারের ভার তাঁর হাতেই নিরাপদ। বাবা খুশি হয়ে বলতেন, "ভাগ্যিষ মহেন্দ্র ছিল।"

রোজ বিকেলে একই অভিনয় হয়। চা যেন আর ফুরোতে চায় না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বাবা আর উচ্চবাচ্য করেন না। ট্যানিক অ্যাসিড উদরস্থ করেন।

মাস কাবারের সময় মুদী এসে বলে, "বাবু মশায়, এক টিন চা আনিয়েছিলেন তার দামটা বাকী আছে।"

বাবা তো অবাক। মহেন্দ্র পিসেকে জিজ্ঞাসা করেন। পিসে ভিজে বেড়ালটি। কী একটা আজে বাজে জবাব দেন। সেইদিনই মহেন্দ্র বিদায়। আমাদেরও চা পান শেষ। যুদ্ধের পরে বাবার অবস্থা একটু ভালো হয়। তখন চা পান আবার শুরু। কিন্তু ততদিনে আমি চলে গেছি বাড়ী থেকে বহু দূরে। কলেজে। যাদের সঙ্গে এক কক্ষে থাকি তারা কেউ চা খায় না। কেননা পায় না। টাকায় কুলোয় না। আমিও কোনো মতে খরচ চালাই।

কলেজের বছর ছয়েক চা পান কদাচিৎ ঘটে। কলেজ বন্ধের সময় নিজের বাড়ীতে। অন্য সময় আর কারো বাড়ীতে। হাতে কিছু পয়সা জমলে একটা স্টোভ কিনি। তাতে চা নয়, কোকো বানাই। যাতে নিদ্রাকর্ষণ হয়। আমার এমন কপাল যে পরীক্ষায় সাফল্য যদি বা এল তার সঙ্গে সঙ্গে এল অনিদ্রা।

যাকে বলে ইনসমনিয়া। বিলেতে গিয়েও তার হাত থেকে রেহাই মেলে না। সেখানেও কোকোই আমার সাথী। তবে চায়েরও খরচ জোটে।

জাহাজে ওরা রোজ ডিনারের পর একটি ছোট পেয়ালায় কফি পরিবেশন করত। বিদঘুটে কালো কফি। কিন্তু কী চমৎকার গন্ধ! বলে কয়ে সেটাকে আমি ধলা করে নিই। প্রচুর দুধ মেশাই। লোকে হাসে। তা হাসুক। কফির টেস্ট থাকে না। না থাকুক। কিন্তু কফি খেলে আমার ঘুম আসে না। অগত্যা জাহাজের কফি পার্টিতে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে জাহাজের ডেকে গিয়ে হাওয়া খাই। তাতে নিদ্রাকর্ষণ হয়।

পশ্চিমে সামাজিক মানুষ হতে হলে চা বা কফি বা মদ খেতে ও খাওয়াতে হয়। ফ্রান্সে তো খাবার জল চাইলে খনিজ জল এনে দেয়। অচেনা শয়তানের চেয়ে চেনা শয়তান ভালো। এটা ইংরেজদের প্রবাদ। আমি চায়ের পাট আবার শুরু করি। দেশে ফিরে এসেও তারই জের চলে।

খাবার আর খবর দুটোই আমার সামনে রাখলে আমি খাবার ছেড়ে খবরটাই আগে ধরি। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে তার পরে খাবারে মন দেওয়া। অবশ্য খেতে খেতেও পড়া যায়, পড়তে পড়তেও খাওয়া যায়। কিন্তু সেটা টেবিল ম্যানার্স নয়। তাতে অন্যের প্রতি অমনোযোগ বা অবহেলা প্রকাশ করা হয়।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমি দ্বিতীয় একটা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ি। অর্থাভাব, বাড়ীতে ইংরেজী কাগজ নেওয়া বন্ধ। বাইরে গিয়ে যখন যা পাই পড়ি। স্কুলের পত্রিকা ঘর ছিল আমার জিম্মা। বেড়ালের জিম্মা মাছ। সেকালের অধিকাংশ বিখ্যাত পত্রিকাই স্কুল থেকে নেওয়া হতো। কিংবা হেডমাস্টার মহাশয়ের নিজের বাড়ী থেকে আসত। এমনি করে আমার 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আমার জীবনে সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু 'সবুজপত্র' বা 'ভারতী' বা 'মানসী ও মর্মবাণী' তো খবরের কাগজ নয়। মাস্টার মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে 'প্রবাসী' পড়তুম। তাতে কিছু খবর থাকত। আর খবর সম্বন্ধে মন্তব্য। এই সময় বিলেত থেকে আসে 'মাই ম্যাগাজিন' ও 'চিলড্রেন্স নিউজপেপার'। আমি স্বর্গ হাতে পাই। বছর বারো কি তেরো তখন বয়স। বুঝি আর না বুঝি বিলিতী কাগজ পড়া আমার চাই। বেশ মনে আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বা তাঁর পত্নীর কোনো এক পূর্বনারী ছিলেন রেড ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেস। খবরটা তারিফ করে ছাপা হয়েছিল।

বাড়ীতে একদিন তুমুল উত্তেজনা। কাকারা কোথায় শুনে এসেছেন উড্রো উইলসন নাকি বলেছেন যে ভারতকে না ভারত প্রভৃতিকে সেল্‌ফ ডিটার-মিনেশনের অধিকার দিতে হবে। তার মানে স্বরাজ আমরা চাইলেই পাব। কাকারা তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাবা করেন না। স্বরাজ কি এত সহজে মেলে? ইংরেজরা কি সহজে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবে? উইলসন বললেই হলো। আমরা সেদিন বাবার উপর বিরক্ত হই।

কেমন করে আমার হাতে কিছু টাকা আসে। 'প্রবাসীর' গ্রাহক হয়ে পড়ি। অন্যের কাছে 'মডার্ন রিভিউ' ধার করি। পরে কলেজে গিয়ে স্কলারশিপের টাকা থেকে 'মডার্ন রিভিউ'য়ের চাঁদা পাঠাই। অমনি করে আমার খবরের তৃষা কতক পরিমাণে মেটে। কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? পড়তে হয় দৈনিক বা সাপ্তাহিক। তখনকার দিনে 'টেলিগ্রাফ' নামে একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক ছিল। বার্ষিক চাঁদা মাত্র দু'টাকা। পরে তিন টাকা হয়। যেমন করে পারি গোটা কয়েক টাকা জোগাড় করে গ্রাহক হয়ে পড়ি। সারা হপ্তার মোটা মোটা খবরগুলো সমস্তই তাতে থাকত। নেতাদের ভাষণের রিপোর্টও। প্রথম যে সংখ্যা আমার হাতে আসে তাতে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা ছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মুক্তি। বারীন্দ্র যখন দ্বীপান্তরিত হন তখন আমি শিশু। একটু বড়ো হয়ে তাঁর দাদা অরবিন্দ ঘোষের নাম শুনি, কিন্তু তাঁর নয়। অরবিন্দ ঘোষ নাকি যুদ্ধের সময় জার্মানীতে পালিয়ে গেছেন অস্ত্র সংগ্রহ করতে। সেই অস্ত্র দিয়ে দেশ উদ্ধার করবেন। আমার সমবয়সীরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়।

'টেলিগ্রাফ' খুলে দেখি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড। সামরিক আইন। খবরের উপর নিষেধাজ্ঞা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধিত্যাগ। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের প্রতিবাদ।

এর আগে বা পরে সুখবরও পড়ি। মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস্। সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ লর্ড উপাধি পেয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাউস অভ লর্ডসের মেম্বর। এক বাঙালার নাইট উপাধি ত্যাগ তো আরেক বাঙালীর ব্যারন উপাধি লাভ। সাড়া পড়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমি চিঠি লিখে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে খবরের কাগজের নমুনা আনাতে আরম্ভ করেছি। মাদ্রাজ থেকে আসে মিসেস অ্যানী বেসাণ্টের দৈনিক 'নিউ ইণ্ডিয়া' আর সাপ্তাহিক 'কমনউইল'। আর অব্রাহ্মণদের

মুখপাত্র 'জাস্টিস'। মিসেস বেসান্টের নাম আমি আগে থেকেই জানতুম। আমাদের বাড়ীতে তাঁর 'শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা' ও তার ইংরেজী অনুবাদ ছিল। পকেট সাইজ, দাম মাত্র দু'আনা। পরে বোধহয় চার আনা হয়। হেড মাস্টার মশায় ছিলেন থিয়সফিস্ট, মিসেস বেসান্টের ভক্ত। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনি সভানেত্রী হয়েছিলেন। তার একটা কৌতুককব বিবরণ ছিল বীরবলের রচনায়। বীরবল তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'অন্ন বাসন্তী'। অধিবেশনে কেন যে মারামারি হয়েছিল মনে নেই। কিন্তু বাঙালী তরুণদের সবুজ পরিধান রক্তে লাল হয়ে যায়। বীরবল ছিলেন বাঙালী পেট্রিয়ট। তাঁর হিন্দু মুসলিম ভেদবুদ্ধি ছিল না, কিন্তু বাঙালী অবাঙালী ভেদবুদ্ধি ছিল। তিনি ও তাঁর মতো হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আর অ্যাটর্নিরাই ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেসের নীতি ও নেতা নির্ধারক। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত বাঙালী সভাপতিরা ছিলেন তাঁদেব লোক। আব দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী। মিসেস বেসান্টের সময় থেকে কংগ্রেস চলে যায় কলকাতাব বাঙালী মডারেট মহলের হাতের মুঠোর বাইরে। কিছুদিন পবে 'বেঙ্গলী'তে দেখি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছাড়লেন।

বোম্বাই থেকে আসে দৈনিক 'বোম্বাই ক্রনিকল' ও 'অ্যাডভোকেট অভ্ ইণ্ডিয়া'। করাচী থেকে দৈনিক 'নিউ টাইমস'। লাহোর থেকে লালা লাজপৎ রায়ের 'বন্দেম তরম'। ওটা কিন্তু ইংরেজী নয়, উর্দু পত্রিকা। এলাহাবাদ থেকে আসে দৈনিক 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' ও সাপ্তাহিক 'ডেমোক্রাট'। উভয়েরই সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র ততদিনে পরম বৈষ্ণব হয়েছেন। 'ডেমোক্রাটের' প্রথম কি দ্বিতীয় সম্পাদকীয় ছিল 'দ্য রোড টু বৃন্দাবন'। সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে স্বত্বাধিকারী মোতিলাল নেহরুব সঙ্গে মতভেদ হয়। বিপিনচন্দ্র পদত্যাগ করেন। 'ডেমোক্রাট' বোধহয় উঠে যায়। কংগ্রেসেব নীতি ও নেতা পরিবর্তনের পর 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' হয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুখপত্র। আমার চিঠির উত্তর দেন পত্রিকার ম্যানেজার জবাহরলাল নেহরু। তখনকাব দিনে অজ্ঞাতনামা।

পাটনার 'সার্চলাইট' থেকে আমি আমার জীবনেব অন্যতম মূলমন্ত্র পাই। 'ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অভ্ লিবার্টি।' স্বাধীনতাব মূল্য চির

জাগৃতি। সম্পাদক ছিলেন বিহারী পেট্রিয়ট। আরো কয়েকখানা কাগজও হাতে আসে। এসব পড়তে পড়তে আমি স্থির করি যে আমিও হব খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখক। আমাদের স্কুলের লাইব্রেরীতে আমেরিকান 'সেলফ এডুকেটর' ছিল। তাতে ছিল সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনার প্রসঙ্গে প্রবন্ধ। এডিটর, সাব এডিটর, রিপোর্টার কার কী কর্তব্য। আমি রিপোর্টার হব না, সাব-এডিটরও না, উন্নতি করতে করতে এডিটর হব। তা যদি না হই তবে ফ্রী-লান্স হব। এই যেমন সন্ত নিহাল সিং। 'মডার্ন রিভিউ'তে আমেরিকাস্থিত ভারতীয় সাংবাদিকদের সম্বন্ধে পড়েছি। তাঁরা যা করছেন তাও তো দেশের কাজ।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ম্যাট্রিক দেবার ইচ্ছে ছিল না, অনিচ্ছাসত্ত্বে দিই। তার পরে কলকাতা যাত্রা, সেখান থেকে পরে একসময় আমেরিকা পলায়ন। চেয়েছিলুম সাংবাদিক হতে। ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু খবরের কাগজ পড়া সমানে চলে। রোজ মাইল খানেক হেঁটে ডাকঘরে যাই, হকার ডেলিভারি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুতে মিলে চার পয়সা দিয়ে 'সার্ভ্যাণ্ট' লুফে নিই। গরম গরম খবর তো থাকেই, সম্পাদকীয়ও তেমনি গরম। একদিন দেখা গেল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নতুন আকারে নতুন প্রকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এখন আর বৈষ্ণবদের ধর্মীয় সাপ্তাহিক নয়, স্বরাজের জন্যে অহিংস সংগ্রামীদের প্রেরণাসঞ্চারী দৈনিক। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মহাত্মা গান্ধী আজ ৫৫ দিন কারাগারে।"

আমি 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিকের নিয়মিত পাঠক ছিলুম। মহাত্মার পর তার সম্পাদক হন মৌলানা মহম্মদ আলীর জামাতা শোয়েব কুরেশী ও তাঁর পরে বা তাঁর আগে মহাত্মার পট্ট শিষ্য চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী। সংক্ষেপে সি. আর.। কারাগার থেকে ফিরে মহাত্মা আবার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। কলেজে ছ' বছর পড়ার পর যখন বিলেত যাই তখন সাপ্তাহিক 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' আর অর্ধ-সপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিয়মিত পাই। তা ছাড়া আরো অনেক পত্রিকা।

বিলেতে আমার সকালের পাঠ্য ছিল 'টাইমস' আর বিকেলের পাঠ্য যেদিন যেটা আগে দেখি— 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' বা 'ইভনিং নিউজ' বা 'স্টার'। রবিবারে পড়তুম 'অবজার্ভার'। জে. এল. গার্ভিন যার প্রখ্যাত সম্পাদক। আর নাট্য

সমালোচক সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট জন আর্ভিন। অন্যান্য পত্রিকাও মাঝে মাঝে পড়তুম। বিশেষত 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' আর 'ডেলী এক্সপ্রেস'। খুব ভালো কাগজ ছিল 'ডেলি নিউজ'। সেটা 'ডেলী ক্রনিকলে'র সঙ্গে জুড়ে হয় 'নিউজ ক্রনিকল'। 'ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট' বোধহয় আমার যাবার আগেই উঠে যায়। ওর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। লিবারল পার্টি তখন ডুবতে বসেছে। তাদের কাগজগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন। ঘোর রক্ষণশীল 'মর্নিং পোস্ট' প্রায় উঠে যাবার দাখিল। রক্ষণশীলরাও এত ভারতবিদ্বেষী নয়। লেবার পার্টির মুখপত্র ছিল 'ডেলী হেরাল্ড'। ভালোই লাগত পড়তে। জর্জ ল্যান্সবেরী ছিলেন সম্পাদক। সরোজিনী নাইডুর সম্বর্ধনা উপলক্ষে যে মধ্যাহ্নভোজন হয় তাতে তিনিও ছিলেন আর ছিলেন 'স্টেটসম্যানের' প্রাক্তন সম্পাদক ভগিনী নিবেদিতার বন্ধু এস. কে. র্যাটক্লিফ। এঁরা দু'জনেই মহৎ ব্যক্তি। ভারতের মিত্র।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পরেও কমলী আমাকে ছাড়েনি। বিলেত থেকে আসত 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান উইকলি' আর 'বার্লিনার টাগেব্লাট' নামক জার্মান দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক ইংরেজী সংস্করণ। লণ্ডনের সাপ্তাহিক 'এভরিম্যান' পত্রিকাও পেতুম। আমেরিকা থেকে বেরোত 'লিভিং এজ' নামে এক অসাধারণ মাসিকপত্র। তাতে সব দেশের পত্রিকার বাছা বাছা ফীচার থাকত। লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার আগে গান্ধীজী বড়লাটকে যে স্মরণীয় পত্র লেখেন তার বয়ান কলকাতার 'অ্যাডভান্স' থেকে তুলে দেয়। সম্পাদকের মতে ওটা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কাগজটা অকালে বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকার বামপন্থী সাপ্তাহিক 'নিউ রিপাবলিক'ও নিতুম। পরে এসব ছেড়ে লণ্ডনের 'নিউ স্টেটসম্যান' সাপ্তাহিক নিতে আরম্ভ করি। সাতচল্লিশ বছর হলো আমি তার গ্রাহক। ইউরোপের সঙ্গে যোগসূত্র এখন ওটাই। আমেরিকার সঙ্গে 'ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক ম্যাগাজিন'।

কলেজের সময়কার কথা পুরোপুরি বলা হয় নি। পাটনায় থাকতে এনতার কাগজ পড়েছি। দেশের নানা প্রদেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক। প্রধানত বিহারী ইয়াংমেনস ইনস্টিটিউটে, পরে সচ্চিদানন্দ সিংহ লাইব্রেরীতে। দু'তিনটি বাদে তখনকার দিনের বনেদি কাগজগুলির এখন অস্তিত্ব নেই। আমার যে সব ক'টা নাম মনে আছে তা নয়। এলাহাবাদের 'পাইয়োনীয়ার' লাহোরের 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট', কলকাতার 'ইংলিশম্যান', ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের

এসব পত্রিকাও আমার নজর এড়ায়নি। সস্তার মধ্যে খুব ভালো পত্রিকা ছিল 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'। মালিক ইউরোপীয়ান, কিন্তু সম্পাদক ভারতীয়। সেটা উঠে যায়, তার প্রেস হাত বদল করে। সেই প্রেস থেকে বেরোয় 'ফরওয়ার্ড'। অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। আমার লেখা ছাপে।

গ্রাজুয়েট হওয়ার পর আমার কলকাতায় এসে সাংবাদিক হওয়ার কথা। সম্ভব হলে 'ফরওয়ার্ডে' অথবা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। প্রফুল্লকুমার সরকার আমার পিতৃবন্ধু। কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। অনিদ্রার মূল্য দিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলুম। সেই মূল্য দিয়ে আই. সি এস. প্রতিযোগিতায়ও কৃতী হলুম। সাংবাদিকতার জন্যে আমার যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি আমার এই প্রতিযোগিতায়ও কাজে লেগে যায়। এতে একটা প্রশ্নপত্র ছিল বর্তমান কাল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান। তা ছাড়া প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হতো এমন সব বিষয়ের কোনো একটাতে যেটার জন্যে খবরের কাগজ পড়া দরকারী। পরিশেষে নেওয়া হতো মৌখিক পরীক্ষা। দেশবিদেশের তরতাজা হালচাল জানা থাকলে চটপট উত্তর দিতে পারা যেত। রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি সবই প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষানবীশ হয়ে বিলেত যাই। সেখান থেকে ফিরে সরকারী চাকরিতে বহাল হই। কিন্তু বরাবরই জানতুম যে সরকারী চাকরি আমার জন্যে নয়, আমিও সরকারী চাকরির জন্যে নই। আমাকে স্বাধীনভাবে লিখতে হবে। আমার অন্যতম মূলমন্ত্র ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অভ লিবার্টি। স্বাধীনতার মূল্য চির জাগ্রতি। সাংবাদিকতাই আমার অভীষ্ট। আমার আদর্শ এইচ ডব্লিউ. নেভিনসন, এইচ. এন. ব্রেলসফোর্ড, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সন্ত নিহাল সিং। খবরের কাগজে না লিখলেও আমি যোগসূত্র অব্যাহত রাখি। বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর মুখপত্রের সঙ্গে। 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' বন্ধ হয়ে যায়, তার জায়গা নেয় 'হরিজন'। সে পত্রিকা যতদিন চলেছিল ততদিন আমি তার গ্রাহক ছিলুম। মহাত্মার পত্রিকাগুলিকে বলতে পারা যেত নিউজপেপার নয়, ভিউজপেপার। সে রকম ভিউজপেপার আরো কয়েকটি ছিল। মৌলানা মহম্মদ আলীর 'কমরেড' দেখেছি। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ ভিন্ন ধর্মের পাঠকদের আকর্ষণ করবে কেন ? নতুবা উচ্চ মানের সাপ্তাহিক। আমার পছন্দসই ছিল 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার'। সম্পাদক কে. নটরাজন। মনে পড়ে না কবে

উঠে যায়।

চাকরি থেকে অকালে অবসর নেওয়ার পর কিন্তু সাংবাদিকতায় মন যায় না। ইতিমধ্যে সাহিত্যে কিছু দূর অগ্রসর হয়েছি। আরো অগ্রসর হতে হলে অনন্য মনোযোগ চাই। সংবাদিক হইনে, কিন্তু সাংবাদপত্রকেও ছাড়তে পারিনে। সেও আমাকে ছাড়বে না। সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি। চারখানা বাংলা ও চারখানা ইংরেজী দৈনিক আমার নিত্য পাঠ্য। এ ছাড়া সাপ্তাহিক তো আছেই। কেন এত পড়ি? কিসের জন্যে এ প্রস্তুতি? ওপারে গেলে চিত্রগুপ্ত প্রশ্ন করবেন, মর্তের হালচাল কী? উত্তর দিতে পারলে স্বর্গ? নইতো নরক? আসল কথা, আমি ওয়াকিবহাল হতে চাই। নইলে লোকে বলবে সেকেলে।